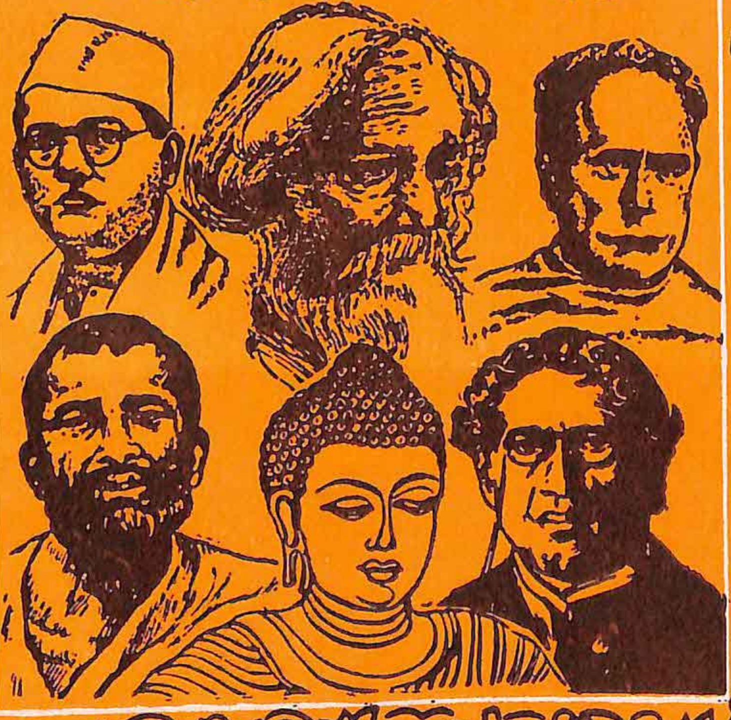
# মহাপুরুষদের জীবন কথা



১৪০

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার নূতন সিলেবাস অনুযায়ী
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ৫ম শ্রেণীর ( Class V )
সহায়ক পাঠ বা দ্রুত পঠন হিসাবে পরিবেশিত

# মহাপুরুষদের জীবনকথা

[ সহায়ক পাঠ ]

[ নবরূপে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ ]

[ পঞ্চমশ্রেণী ]

কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুলের
বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রবীণ শিক্ষক

**হীরালাল ভট্টাচার্য**

প্রণীত

**টিচার্স কনসার্ন**

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অহিংসার পূজারী গৌতম বুদ্ধ | ১ |
| ২। | প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য | ৫ |
| ৩। | পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ | ৯ |
| ৪। | ভারত সাধক স্বামী বিবেকানন্দ | ১৩ |
| ৫। | ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় | ১৭ |
| ৬। | দার্শনিক ও দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ | ২০ |
| ৭। | দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর | ২৪ |
| ৮। | জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী | ২৮ |
| ৯। | বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ | ৩২ |
| ১০। | বাংলার বাঘ আশুতোষ | ৩৬ |
| ১১। | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন | ৪০ |
| ১২। | দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র | ৪৪ |
| ১৩। | বিজ্ঞান-তপস্বী জগদীশচন্দ্র | ৪৭ |

নবরূপে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ ১৯৮৬-৮৭

মূল্য—আট টাকা মাত্র

প্রকাশক
স্বপনকুমার ভট্টাচার্য
টিচার্স কনসার্ন
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলকাতা-৯



মুদ্রাকর
বঙ্কিম মজুমদার
বি. কে. প্রিন্টার্স
৬০-এ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৯

ধর্ম প্রচারক—

# অহিংসার পূজারী গৌতম বুদ্ধ



শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূণ্য

আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। হিমালয়ের নীচে কপিলাবস্তুর কাছে লুম্বিনি গ্রামে রাজা শুদ্ধোধন ও রাণী মায়া দেবীর সংসারে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেন। শিশুটি অপূর্ব লাবণ্যময়, সর্বাঙ্গে যেন স্বর্গের আলোক মেখে এসেছে। এই শিশুর নাম রাখা হল গৌতম বা সিদ্ধার্থ। পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থই ভগবান বুদ্ধ নামে পৃথিবী বিখ্যাত হন। শৈশবেই সিদ্ধার্থ মা-হারা হন। রাণী মায়াদেবীর সিদ্ধার্থের জন্মের পরে মৃত্যু হয়েছিল।

ক্ষত্রিয় রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ। ক্ষত্রিয় রাজাদের যুদ্ধ শিকার প্রভৃতি কাজেই স্বাভাবিক সবচেয়ে বেশী আনন্দ। হিংসা, হত্যা, রক্তপাত এ সকল ব্যাপারে মানুষ বিন্দুমাত্র কাতর হত না। ঐ গুলিকে তারা বীরের ধর্ম বলে মনে করত। তাই তাদের মনে দয়ামায়ার চেয়ে হিংসা ক্রোধই বেশী দেখা যেত।

কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পুত্র সিদ্ধার্থ শিশুকাল থেকেই অপরের দুঃখ দেখে চোখের জল ফেলতেন। শুধু মানুষ নয় পশুপক্ষী, জীবজন্তু কারো কোন কষ্ট দেখলেই বেদনায় তাঁর বুক ফেটে যেত। দেখা যেত এই রাজপুত্রটির ভোগবিলাসে তেমন মন নেই উদাস মন নিয়ে সংসারের বাইরে সে যেন কি

খুঁজে বেড়ায়। শৈশবেই দেখা যেত সিদ্ধার্থ ভাবুক প্রকৃতির; আশেপাশের ঐশ্বর্যে সে একেবারে উদাসীন।

সব শিশুই শৈশবে নিজেকে নিয়েই নিজে ব্যস্ত থাকে কিন্তু সিদ্ধার্থের চিন্তা অপরকে নিয়ে সংসারে জীবের দুঃখকষ্টের শেষ নেই, তাদের রোগ শোক থেকে কি ভাবে রক্ষা করা যায় তাই সিদ্ধার্থের ভাবনা। প্রহ্লাদের কাহিনীতে দেখা যায় তিনি কৃষ্ণের জন্য শৈশব থেকেই কেঁদে আকুল, আর সিদ্ধার্থের বেলায় দেখি মানুষের জন্য তার গভীর ব্যাকুলতা।

শৈশব পার হয়ে সিদ্ধার্থ যৌবনে পা দিলেন। কোথায় রাজপুত্র ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে উঠবেন, তা নয় বৈরাগ্যে তিনি যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রাজপুত্রের এই বৈরাগ্য রাজা শুদ্ধোধনের দৃষ্টি এড়াল না। পুত্রের এই উদাসীনতা তাকে চিন্তিত করে তুলল। ভিখারীর ছেলে ঘোড়ায় চড়লে তার জন্য যেমন তার বাপের ভাবনা হয়, রাজার ছেলে পথের ধূলো গায়ে মাখলেও তার পিতার তেমনি দুশ্চিন্তা হয়। রাজা শুদ্ধোধন ভাবলেন বিয়ে দিয়ে সংসারের বন্ধনে পুত্রকে বাঁধতে পারলে হয়ত সিদ্ধার্থের এই বৈরাগ্যের ভাব চলে যাবে। চারদিকে সংবাদ পাঠিয়ে অবশেষে তিনি একটি সুন্দরী কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিলেন। কন্যার নাম গোপা। কালক্রমে সিদ্ধার্থ একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, তার নাম রাহুল।

পিতা শুদ্ধোধনের ধারণা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল। দেখা গেল স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য সুখ কিছুই সিদ্ধার্থকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। সকল সময় এক চিন্তা কালো মেঘের মত তার হৃদয়-আকাশ জুড়ে থাকে। মানুষের দুঃখ ও হাহাকার তার মনের মধ্যে শয়নে স্বপনে জেগে থাকে। তিনি দেখলেন সকল মানুষের সকল জীবের একমাত্র পরিণতি হল রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যু। তাদের হাত থেকে কারো মুক্তি পাবার উপায় নেই। এই যদি মানুষের জীবনের পরিনাম হয়, তবে সংসারে মানুষ কোন সাহসে সুখে আরামে বাস করে? মানুষ এই দুঃখকর পরিণাম থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে না কেন? সিদ্ধার্থ স্থির করলেন তিনি মানুষের মুক্তির পথ, শান্তির পথ খুঁজে বের করবেন। সে পথ ঘরের দুয়ারে নেই সে পথ বড় দুর্গম, তা তিনি জানতেন।

মানুষের ঐ দুঃখবেদনাই সিদ্ধার্থকে একদিন ঘরছাড়া করল। একদিন নিশীথে যখন বিশাল রাজপুরী নিস্তব্ধ, সেই সময়ে তিনি স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য, সুখ-ঐশ্বর্য সব কিছু পেছনে রেখে পৃথিবীর দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বৈশালী নগরীতে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের বাস। সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে প্রথমে সেইখানে গিয়ে হাজির হলেন ভাবলেন যদি জ্ঞান অর্জন করে সেই পথের কোন সন্ধান পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের কাছে তিনি মনোযোগ দিয়ে বেদ পুরাণ পাঠ করলেন। কিন্তু তার মন তাতে ভরল না। যে পথের তিনি সন্ধান করছিলেন সেই পথ তিনি ঐ ভাবে পাবেন না বলে বুঝতে পারলেন। এর পর

তিনি গেলেন রুদ্র নামে এক ঋষির কাছে যোগাভ্যাস শিক্ষা করতে। কিন্তু তাতেও তাঁর মন ভরল না।

এর পর তিনি শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। গয়ার কাছে এক গভীর বনে তিনি আশ্রয় নিলেন। কঠিন তপস্যায় ক্রমে তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার কঙ্কাল হয়ে উঠল। কিন্তু কোথায় পথের সন্ধান, কোথায় তার প্রশ্নের উত্তর ?

অশান্ত মনে বন ত্যাগ করলেন সিদ্ধার্থ। ব্যাকুল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন বুদ্ধ গয়ায়। সেখানে তিনি এক বোধি অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে আসন নিলেন। ইতিমধ্যে সিদ্ধার্থের এই উপলব্ধি হয়েছে যে তপস্যায় দেহ ক্ষয় করা যায়, কিন্তু তাতে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করা যায় না।

বোধিবৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থের অবস্থানের সময় এক অঘটন ঘটে। বনদেবতার পুজো দিতে সুজাতা নামে এক বণিক-বধূ পায়েস নিয়ে সেখানে আসেন। সিদ্ধার্থের শান্ত সৌম্য মূর্তি দেখে তিনি ভাবলেন ইনিই বুঝি বনের দেবতা। সুজাতা তখন সিদ্ধার্থকে পায়সান্ন নিবেদন করে নিজেকে ধন্য বলে মনে করলেন। সিদ্ধার্থ পায়সান্ন গ্রহণ করে নতুন জীবন লাভ করলেন।

নৈরাঞ্জনা নদীর পারে বোধিবৃক্ষের নীচে আবার নতুন করে সাধনা সুরু করলেন তিনি। দীর্ঘ গভীর ধ্যানের পর তাঁর অন্তরে জ্ঞান ও সত্যের আলোক এইবারে জ্বলল। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। যে সত্যের সন্ধান তিনি এতদিন ধরে করছিলেন, সেই সত্য তিনি লাভ করলেন। কাশীর কাছে সারনাথে তিনি তাঁর পাঁচজন শিষ্যকে প্রথম তিনি তাঁর নবলব্ধ সত্যের বাণী শোনালেন।

বুদ্ধদেব প্রচার করলেন; ভোগ ও তপস্যা এই দুটির মধ্যের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। তিনি শিক্ষা দিলেন, মুক্তি বা নির্বাণ লাভের উপায় হল আটটি। এই আটটি উপায় হল: সম্যক দৃষ্টি, সংবাক্য, সংকার্য, সংসংকল্প, সংজীবন, সংচেষ্টা, সংস্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বুদ্ধমতের এই আটটি বিধানকে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বা পথ বলা হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূল কথা অহিংসা। সেকালে যে সকল যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলি প্রচলিত ছিল তা ত্যাগ করবার জন্য বুদ্ধদেব সকলকে উপদেশ দিলেন। অহিংসা ও জীব-প্রেমের এই বাণী সকল মানুষের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। হিংসা যে পাপ, তা মানুষ যেন পাপের মধ্যে থেকে ভুলে গিয়েছিল। বুদ্ধের উপদেশে তারা বুঝতে পারল, হিংসা দ্বারা জীব একে অপরের কতখানি ক্ষতি করে। অহিংসার মন্ত্র, প্রচলিত ধর্মকর্মে এক বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করল।

ক্রমে ক্রমে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলে বুদ্ধের প্রচারিত নবীন ধর্মমত গ্রহণ করল। এই ধর্মের মূলকথা মানব-প্রেম ও জীব প্রেম। সকল মানুষকেই প্রভাবিত করে তুলল এই নবীন বাণী। মানুষে মানুষে সমান অধিকার ও মর্যাদার যে বাণী বুদ্ধদেব প্রচার করেন, এর আগে তা আর কেউ উচ্চারন

করে নি। তাই দলে দলে লোক এসে বুদ্ধদেবের দর্শনের জন্য ভীড় করে দাঁড়াল। সকলে এক সুরে উচ্চারণ করল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—আমি বুদ্ধের শরণ নেব।

বুদ্ধদেব প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে বিহার ও অযোধ্যায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমবায় ও একতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধসংঘও স্থাপন করেন। সাধারণ লোক থেকে শুরু করে মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁর ভক্ত হন। আশী বছর বয়সে কুশীনগরে গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের বহু সত্য আমাদের শিখিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের সব দুঃখকষ্ট ও লোভ অজ্ঞতা থেকেই জন্মে। মানুষের পতন ঘটে তার লোভ থেকে। সৎকাজের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করতে পারলে তবেই দুঃখকষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' ছাড়াও বুদ্ধদেব আরও কয়েকটি নীতি মেনে চলবার উপদেশ দিয়েছেন। এই সকল নীতি হল—অহিংসা, সত্যবাদিতা, ঐশ্বর্য, ত্যাগ, চুরি না করা, পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা, অর্থলোভ ত্যাগ করা ও পশুবলি না দেওয়া।

বুদ্ধদেব মুখে মুখে তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। তার বাণী বা ধর্মনীতি সে আমলে লিখে রাখা হয় নি। তাঁর দেহরক্ষার পরে বৌদ্ধসভায় ঐ বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়। 'সূত্র-পিটক' নামক গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশাবলী লেখা আছে। বুদ্ধদেবের পুনর্জন্মের কাহিনীগুলি 'জাতক' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

সমগ্র এশিয়াতেই বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যিনি পরবর্তী কালে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ছিলেন তিনি হলেন সম্রাট অশোক। তাঁরই চেষ্টায় দেশ-বিদেশে এই ধর্মমত ছড়িয়ে পড়ল। সম্রাট অশোক কঠিন পাথরের গায়ে বুদ্ধের উপদেশগুলি খোদাই করে দিয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সংঘ সারা দেশে বিদ্যমান। সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের আদর্শ প্রভাবেই 'চণ্ডাশোক' থেকে 'ধর্মাশোকে' পরিবর্তিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—রাজা বিম্বিসার, বণিক অনাথ পিণ্ডদ, সারিপুত্ত মুগ্গালন, আনন্দ ও উপালি।

———

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

## প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য



"ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বরূপের ছায়া,
বাঙালী-হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া॥"

বঙ্গদেশের পরম সৌভাগ্য যে এই দেশে যুগে যুগে দেবতা মানুষের ঘরে এসে দেখা দেন। আমরা আমাদের ভাঙ্গা কুটীরেই মানুষের মধ্যে ভগবানের লীলা দেখি, তার জন্য মাটির পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও খুঁজতে হয় না। শ্রীচৈতন্যকে আমরা ঐভাবেই পেয়েছিলাম।

১৪০৭ শকাব্দে দোল পূর্ণিমার মধুর সন্ধ্যায়, নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। মাতার নাম শচীদেবী। এই আদরের শিশুটির উপর কারো কুদৃষ্টি যাতে না পড়ে তাই তার নাম রাখা হয়েছিল নিমাই—নিমের স্বাদ তেতো, তেতো জিনিষের উপর কারো লোভ হয় না। তাই তাঁর ডাক নাম নিমাই, কোষ্ঠির নাম বিশ্বম্ভর। নিমাই বাপ-মার নয়নের মণি।

বড়ভাই বিশ্বরূপ ষোল বছর বয়সেই লেখাপড়া করার কালেই সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাই লেখাপড়ার ওপর শচীদেবীর বড় ভয়। কিন্তু নিমাই-এর দুরন্তপনাতেও যে ঘরে টেকা

যায় না। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে লোকে স্নান করতে আসে, সে তাদের গামছা নিয়ে পালিয়ে মজা দেখে। গঙ্গার ঘাটে ধ্যানে বসেছেন কোন পণ্ডিত, চোখ বন্ধ, নিমাই তাঁর টিকি কেটে দিয়ে দৌড় মারে। মেয়েদের পূজার জন্য আনা নৈবেদ্যের চালকলা সে কেড়ে খায়; দূর থেকে ঢিল মেরে তাদের জলের কলস ভেঙ্গে দেয়। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে নিমাইকে গঙ্গাদাসের টোলে ভর্তি করে দেওয়া হল। বাপ-মা ভেবেছিলেন গঙ্গাদাসের বেতের চোটে নিমাই শান্ত হবে। কিন্তু দেখা গেল বেত নয়, লেখাপড়ায় আনন্দেই সে দুরন্তপনা ভুলে গেছে। অল্পদিনের মধ্যেই নিমাই শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল।

এর কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে নিমাই টোল খুললেন। নিমাই পণ্ডিতের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর টোলে তখন আর ছাত্র ধরে না। বড় বড় পণ্ডিত তাঁর কাছে তর্কে হার মেনে মাথা নিচু করে চলে যায়।

নিমাই-এর প্রথমা স্ত্রীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। তার পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

পিতার পিণ্ডদানের জন্য ষোল বছর বয়সে নিমাই গয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে ঈশ্বর-পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে যখন তিনি ঘরে ফিরে এলেন তখন তিনি আর এক মানুষ; দিনরাত্ত তখন তিনি হরিনামে বিভোর। তিনি টোল বন্ধ করে দিলেন। সংসারে তার তখন মন নেই, মানের অহংকার নেই, পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। পাশেই শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে সবান্ধব দিনরাত তিনি হরিনাম কীর্তন করেন। কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বলে সব সময় চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে।

নবদ্বীপের তখন বড় দুর্দিন—নবদ্বীপের লোক তখন ভগবানের নাম ভুলে টাকা-পয়সার চিন্তাতেই মত্ত, অধিকাংশ লোকই আলস্যে বিলাসে দিন কাটায়। হিন্দু-মুসলমান, ধনী দরিদ্রে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে তখন সমাজে নানা বিভেদ। মানুষে মানুষে এই ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে লোকের মুখে ভগবানের নাম কীর্তনের জন্য নিমাই নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম করে বেড়াতে লাগলেন। এই কাজে তার সঙ্গী হলেন নিত্যানন্দ বলে এক সন্ন্যাসী, আর এক মুসলমান ঘরের ছেলে, যাঁর পরবর্তীকালে নাম হল হরিদাস।

নবদ্বীপের পথে ঘাটে দেখা গেল এক সোনার বরন তরুণ তার সঙ্গীসাথী ভক্তদের নিয়ে মধুর কণ্ঠে হরিনাম করে বেড়ান। তাঁর অপরূপ কণ্ঠে হরিনাম শুনে লোকে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে তার কীর্তনের সুরে সুর মেলাল। ব্রাহ্মণের ঘরের দুই ভাই জগন্নাথ ও মাধব। তারা পেয়াদার কাজ করে, নেশার ঘোরে রাস্তার লোকজন ধরে মারধর করে। লোকের কাছে এই দুই পাষণ্ড জগাই মাধাই নামে পরিচিত। একদিন নেশার ঘোরে কীর্তনের হরিনাম শুনে এত রেগে গেল যে শেষ পর্যন্ত মাধাই

রাস্তার একটি ভাঙা কলসির কানা তুলে নিয়ে নিত্যানন্দকে ছুঁড়ে মারল। নিত্যানন্দের মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, তবুও তাঁর সহাস্য মুখে কিন্তু হরিনাম লেগে। এই দৃশ্য দেখে জগাই অবাক হল, মাধাই আবার মারতে গেলে সে তাকে ঠেকাল।

এ সংবাদ নিমাই-এর কানে পৌঁছোতে তিনি ছুটে এলেন। তখন তার ক্রুদ্ধ মূর্তি, চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। জগাই-মাধাই কাউকে ভয় করে না, কিন্তু সেই দিন তারা কি দেখল কে জানে, নিমাই-এর চরণে লুটিয়ে তার দয়াভিক্ষা চাইল। তারা মুখে কৃষ্ণনাম নিতেই দয়াল ঠাকুর তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অত্যাচারী জগাই-মাধাই পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ও মাধব হল।

কথায় আছে—"শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।" নবদ্বীপকে লোকে নদীয়া সংক্ষেপে নদে বলত। সত্যিই নিমাই-এর হরিনাম গানের সুরে নদীয়া ভরে গেল, আর ভক্তি ও প্রেমের স্রোতে নদে ভেসে গেল। নিমাই ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকেই বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তাঁর মত ছিল, নীচ চণ্ডাল যদি ভক্তিমান হয় তবে সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই সব দেখে নবদ্বীপের একদল লোকের মনে হল নিমাই পণ্ডিত ছোটলোকদের বড় মাথায় তুলেছেন, এর পর তাদের আর দাবিয়ে রাখা চলবে না। তারা কাজীর কাছে নালিশ করলেন, যে নিমাই পণ্ডিত হিন্দুধর্ম লোপ করতে বসেছেন, পথে পথে ছোটলোকদের নিয়ে নামগান করে বেড়ান। কাজী হুকুম দিলেন নবদ্বীপের পথে কেউ হরিনাম করতে পারবে না। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে, হরিনামে তখন নদীয়া ডুবু ডুবু। দেখা গেল নিমাই পণ্ডিতের পিছনে হাজার হাজার লোক খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করতে করতে সহাস্য মুখে চলেছে, সে মুখ দেখে মনে হয় হরিনাম তাদের মুখ হতে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। উপায় না দেখে কাজী শেষ পর্যন্ত তার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। হরিনামের স্রোতে এই ভাবে নবদ্বীপ ভেসে গেল।

যে একবার হরিনাম সুধার স্বাদ পেয়েছে সংসারে কি তার আর মন বসে? কাটোয়ায় থাকেন কেশব ভারতী, নিমাই তার কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হলেন। সন্ন্যাসী হবার পরে তাঁর নাম হল—কৃষ্ণচৈতন্য—চৈতন্য নামেই তিনি ভুবনবিজয়ী। তার সন্ন্যাসী হবার ঘটনা বড় করুণ। সকল নদীয়াবাসী চোখের জল ফেলে হাহাকার করতে লাগল। শচীদেবী 'নিমাই, নিমাই', বলে পাগলিনীর মত বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে হরিমন্ত্র দিয়ে ধনী-নির্ধন, ছোট-বড় সকল লোককে ভক্তিতে একাকার করে দেবার যার ব্রত সে ত বন্দী হয়ে ঘরে থাকতে পারে না। মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি প্রথমে পুরী এলেন। সমুদ্রের ধারে বিশাল মন্দিরে জগতের মানুষের দেবতা জগন্নাথ থাকেন। দূর হতে তাকে দেখে কোলে নেবার জন্য ছুটলেন। কিন্তু আনন্দের আবেগে পথের মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গীরা হরিনাম করে তার জ্ঞান ফেরাল। পুরীতে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি একজন সহচর নিয়ে সারা দক্ষিণ ভারত এবং দাক্ষিণাত্য ও

গুজরাট ভ্রমণ করলেন। তার পর গৌড়দেশ হয়ে কাশী, বৃন্দাবন ও মথুরা ঘুরে এলেন। চৈতন্যদেব যেখানে যান তার প্রেমধর্ম সকল লোকের মনকে জয় করে নেয়। বড় বড় পণ্ডিতেরা পর্যন্ত তার পায়ে লুটিয়ে পড়েন। পাণ্ডিত্য আর ভক্তি একই লোকের মধ্যে এমনভাবে কখনো আগে দেখা যায় নি। বাংলার সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন দুই ভাই—রূপ আর সনাতন। তারা চৈতন্যদেবকে দেখে মুগ্ধ হন, তারপর সংসার ও উচ্চপদ, গৌরব সব কিছু ছেড়ে চৈতন্যের ভক্ত হলেন। চৈতন্যদেবের আদেশে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে হরিনাম সম্বল করে বাস করতে লাগলেন।

জীবনের শেষ ভাগ চৈতন্যদেব পুরীতে কাটান। প্রায় আঠারো বছর তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে ছিলেন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র দেব তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। পুরীতে যারা তাঁর সাথে সাথে ফিরতেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, গদাধর, হরিদাস, বাসুদেব সার্বভৌম, প্রভৃতি ভক্তগণ। হরিদাসের মৃত্যু পুরীতে হয়। চৈতন্যদেব পুরীর সমুদ্রতীরে নিজের হাতে হরিদাসের দেহ সমাধিস্থ করেন।

স্নানযাত্রার সময়ে পুরীতে আনন্দের হাট বসে যেত। নানা স্থান হতে তাঁর ভক্তরা পুরীতে এসে একত্র হতেন। মহা আনন্দে নামগান চলত।

শেষের কয় বৎসর চৈতন্যদেব ভগবৎভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। ঐ অবস্থাতেই ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে তিনি দেহরক্ষা করেন। ভালবাসাই যে ভক্ত-ভগবানে, মানুষে-মানুষে প্রভেদ ঘুচিয়ে দেয়, চৈতন্যদেব তা নিজের জীবন দিয়ে আমাদের দেখিয়ে গেছেন।

———

ভালবাসাই যে ভক্ত ভগবানে মানুষে
মানুষে প্রভেদ ঘুচিয়ে দেয়

# পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



"মানুষের ভিতরে নারায়ণ। দেহটি আবরণ,
যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো।

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে এক গরীব ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করতেন। ১৮৩৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ার পবিত্র ব্রাহ্ম মুহূর্তে ক্ষদিরামের ঘরে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণ ক্ষুদিরামের তৃতীয় পুত্র।

ক্ষুদিরাম ছিলেন রঘুবীরের পরম ভক্ত। ঠাকুরের পূজা ছাড়া তিনি আর কিছু চান না। ক্ষুদিরামের ভক্ত-মন তার কানে কানে বলে দিয়েছিল যে তাঁর ঘরে পুত্ররূপে নারায়ণ আসছেন। রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হবার আগে মা চন্দ্রমণি কখনো নূপুরের শব্দ শুনতে পেতেন, কখনো বা চন্দনের গাঢ় সুগন্ধ তাঁর আশেপাশে আসত। ক্ষুদিরাম বুঝতে পেরেছিলেন তার বিশ্বাস মিথ্যে হবে না।

ছেলের নাম রাখা হল গদাধর। ঐটুকু ছেলে কিন্তু বড় দুরন্ত, বড় চঞ্চল কিন্তু গ্রামের সকলের কাছে বড় প্রিয়। গ্রামের পাঠশালায় গদাধরকে ভর্তি করা হল লেখাপড়ার জন্য। কিন্তু লেখাপড়ায় তার টান নেই। পাঠশালার বাহিরে তাঁর যত আনন্দ। প্রহ্লাদ চরিত পড়ে দশজনকে শোনাতে ভাল লাগে। গাছতলায় দল বেঁধে যাত্রাগান করায় তাঁর আনন্দ। গলা ছেড়ে গান গাইতে সে যেমন ওস্তাদ তেমনি ওস্তাদ ছবি আঁকায়। যে গান সে গায় তা মধুর হরিনাম। কিন্তু পাঠশালার অঙ্ক দেখলেই তার যত আতঙ্ক।

গদাধরের যখন সাত বছর বয়স তখন পিতা ক্ষুদিরাম মারা গেলেন।

গ্রামে লেখাপড়া কিছুই হয় না। তাই বড় ভাই রামকুমার গদাধরকে কলকাতায় নিয়ে আসলেন। সেখানে যদি কিছু হিল্লে হয়। কিন্তু চাল কলা-বাঁধা বিদ্যাতে যার লোভ নেই তাকে কলকাতায় এনে কাজে লাগিয়ে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

কিন্তু কাজ জুটে গেল। কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। রাণী রাসমণি স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঐখানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামকুমার পূজারী হিসেবে কাজ করতেন। রাণী রাসমণির জামাই মথুরামোহন বিশ্বাস যিনি মথুরবাবু বা মেজবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন, তিনি হঠাৎ গদাধরকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি গদাধরকে প্রথমে মায়ের বেশকারীর কাজে ও পরে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু কিসের পূজা, কিসের মন্তর! গদাধর পূজার কোন নিয়ম মানে না, মূর্তির সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন। কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে শিশু যেমন কাঁদে সেই ভাবে কেঁদে ওঠেন। পূজা করতে করতে হঠাৎ কখনো ফুল নিজের মাথায় রাখেন। সাধকের মুখে কেবল এক কথা "মাগো, তুই কই? আমাকে কৃপা কর, আমাকে দেখা দে। আমি ধনজন, ভোগ বৈভব কিছুই চাই না, মা। শুধু তোকে চাই। তুই দয়া কর, দেখা দে।" আমাকে রসে-বসে রাখিস মা, শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে।

পঞ্চবটীর চারিদিকে ঘোর জঙ্গল। সেই অন্ধকারে যদি মায়ের দেখা পান তাই গদাধর সেখানে গিয়ে নিশীথ রাত্রে ধ্যান করেন; মন্দিরে যাকে পাওয়া গেল না, আলোয় যিনি দেখা দিলেন না, তিনি যদি আঁধারে তার কাছে এসে দাঁড়ান।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। গদাধর মার দর্শন না পেয়ে পাগলের মত হয়ে গেলেন। হঠাৎ কালীঘরের ঝুলানো খড়্গ টেনে এনে নিজের গলায় আঘাত করতে গেলেন গদাধর। মা দেখা দেন না, সেই নিষ্ঠুরতার সে প্রতিশোধ নেবে।

কিন্তু গলায় যেই আঘাত করতে গেল, অমনি সামনে মা এসে দাঁড়ালেন। মা মা বলে মেঝের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল গদাধর।

মার দেখা পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেল গদাধর। কখনো সে মাকে গান শোনায়। মূর্তির সঙ্গে কথা বলে, ঝগড়া করে, কখনো আবদার করে।

এমন পাগলকে মন্দিরে রাখায় সবার আপত্তি, কিন্তু মথুরবাবু গোপনে একদিন দেখে বুঝতে পারলেন যে গদাধর মায়ের নামে মাতোয়ারা। এ কি অদ্ভুত প্রেম ভক্তি এই তরুণ পুরোহিতের? গদাধর মন্দিরেই থেকে গেল।

চব্বিশ বছর বয়সে গদাধরের বিবাহ হল সারদামণির সাথে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের প্রথম

গুরু এক ভৈরবী। তিনি রামকৃষ্ণকে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন। তারপর তোতাপুরী নামে এক নাগা সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিলেন। তখন থেকেই তাঁর নাম হল রামকৃষ্ণ। তোতাপুরী তাকে ধ্যানে বসিয়ে এক সময় চেয়ে দেখলেন চল্লিশ বৎসর সাধনা করে তিনি যে শক্তি অর্জন করেছেন রামকৃষ্ণ তা তিন দিনে পারেন। রামকৃষ্ণের শক্তি দেখে বিস্ময় আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন তোতাপুরী —ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া! এই সময় রামকৃষ্ণ মায়ের নানা রূপ দেখতে পেতেন। কখনো সুন্দরী বালিকার রূপে, কখনো বা মায়ের জগজ্জননী রূপে।

রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে অহংকার দূর না হলে সত্যিকার আনন্দ লাভ করা যায় না। মন হতে যাতে অহংকার দূর হয় সেই জন্য তিনি নীচ ও অস্পৃশ্য লোকদের কর্ম নিজ হাতে করতেন। গভীর রাতে উঠে তিনি মেথরের মত ঝাড়ু হাতে সকলের পায়খানার ময়লা পরিষ্কার করতেন। কালীমন্দিরের উঠোনে ছত্রিশ জাতের লোক প্রসাদ পেল। রামকৃষ্ণ কারো কোন নিষেধ না শুনে নিজে সেই সব লোকের উচ্ছিষ্ট পরিকার করতেন। তাদের পাতের খাবার খেতেন। এইভাবে তিনি তার মনের অহঙ্কার একেবারে দূর করে দিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণের একবার ইচ্ছা হল, তিনি সকল ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি জানবেন। তিনি একে একে খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মগুরুর শিষ্য হলেন। ঐসকল ধর্মের আচার ব্যবহার তিনি পালন করতেন। প্রত্যেক বারই তিনি ঐ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এইভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জগতে সত্যই 'যত মত, তত পথ'' রয়েছে। সকল নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেশে, সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক ভগবান। কোন ধর্মের ভুল নেই। প্রত্যেক ধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে। জলকে যেমন কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার, সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরকে কেউ বলে হরি, কেউবলে ব্রহ্ম, কেউবলে আল্লা, আবার কেউ গড্ বলে।

সিদ্ধিলাভ করবার পর রামকৃষ্ণ সর্বদাই আনন্দে ডুবে থাকতেন। আনন্দে উচ্ছ্বাসে তিনি কখনও হাসতেন কখনো কাঁদতেন। এই মহাপুরুষ যে অলৌকিক শক্তি লাভ করেছেন সেটা আর কারো অজানা রইল না। দলে দলে লোক এসে তার উপদেশ ও বাণী গ্রহণ করতে লাগল।

রামকৃষ্ণ লেখাপড়া শেখেন নি, কিন্তু তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। সামান্য সরল গ্রাম্যলোকের মত তিনি সকলের সাথে কথাবার্তা বলতেন। আবার সরল ভাষায় কখনো কোন গল্প বলে তিনি শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নের সমাধান করে দিতেন। সে আমলের বহু শিক্ষিত লোক তাঁর একান্ত ভক্ত ছিল। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি শিক্ষিত লোকেরা তার উপদেশ শুনবার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। সকলের চেয়ে রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংসারের দিকে একেবারে টান ছিল না। সংসার-সুখকে তিনি বিষের মত ঘৃণা

করতেন। এক হাতে মাটি, আর এক হাতে কিছু টাকা নিয়ে ; মাটি-টাকা, টাকা-মাটি বলতেন। অর্থকে তিনি সাধারণ মাটির মত তুচ্ছ বলে মনে করতেন। বিছানার তলায় টাকা রাখলে তিনি ঘুমতে পারতেন না। তার গায়ে টাকা ছেঁায়ালে সেই স্থান কুকড়িয়ে যেত।

একদিন রামকৃষ্ণ গান করছেন, রাণী রাসমণি ধ্যানে চোখ বুজে আছেন। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তিনি রাণীর গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ধমক দিয়ে উঠলেন 'এখানেও ঐ চিন্তা?' রাণী বুঝলেন মা রামকৃষ্ণের হাত দিয়ে তাকে শাসন করেছেন এবং ধন সম্পত্তি, ঐশ্বর্য সাধনার পথের বড় বাধা বুঝিয়ে দিলেন।

রামকৃষ্ণ উপদেশ দিতেন, বিষয় বিষ, ঈশ্বরই সব কিছুর বড়। ভগবানের জন্য যখন মন আঁকুপাকু করে তখনই ভগবানকে পাওয়া যায়। মা যেমন সাত কাজের মধ্যে ছেলের কথা মনে রাখে, সেইরূপ সংসারের হাজার কাজের মধ্যেও ভগবানকে স্মরণে রাখতে হয়। চাঁদ মামা সকল শিশুর মামা। তেমনি ঈশ্বর সকলের আপনার। তুমি প্রাণভরে ডাকলে তোমাকেও তিনি দেখা দেবেন। মাছ পুকুরের যেখানেই থাক, একবার চার ফেললে ছুটে আসে। সেই রকম ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত ডাকলেই ঈশ্বর তার কাছে ছুটে আসেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ষোলই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরা তাঁর বাণী এদেশে ও বিদেশে প্রচার করেন। শুধু ভারত নয় সুদূর ইউরোপ, আমেরিকার অসংখ্য মানুষ তাঁকে ভগবানের অবতার বলে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘ ভারতেব সর্বত্র এই সেবা ধর্মের মধ্য দিয়ে 'বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ঐহিক অমরতা লাভ করেছেন। প্রতি নরনারীর অন্তরে এই দুই মহাপুরুষ চির ভাস্বর।

———

যত মত তত পথ

ভারত সাধক ও ধর্ম প্রচারক—

## ভারত সাধক স্বামী বিবেকানন্দ



"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর—"

গেরুয়া বসন পরা এক সন্ন্যাসী, উজ্জ্বল আয়ত দুটি চোখ মেলে চেয়ে আছেন, তাঁর চোখে মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি। দেশের ঘরে ঘরে এই ছবিটি সকলের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগরণ করে। ইনিই বাংলার গৌরব ও ভারতসাধক স্বামী বিবেকানন্দ। মেধা, তেজস্বিতা ও কঠোর সাধনা এই সকল গুণে তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ মানুষ।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলকাতায় শিমুলিয়া অঞ্চলে বিখ্যাত দত্তবংশে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। বাল্যকালে প্রথমে তাঁর নাম রাখা হয় বীরেশ্বর—সকলে ডাকত বিলে বলে। অন্নপ্রাশনের পর তাঁর নাম রাখা হয় নরেন্দ্রনাথ।

মা ভুবনেশ্বরী বিশ্বাস করতেন শিবপূজোয়, শিবের দয়ায় তিনি সন্তান লাভ করেছেন। সত্যই বিলে শিশু ভোলানাথ। দুর্দান্ত ছেলে বাড়ীতে তাণ্ডব করে বেড়ায়। এ জিনিস ভাঙ্গে ত ও জিনিস

ছুঁড়ে ফেলে। ভাল কাথায় বা চোখ রাঙিয়ে তাঁকে শান্ত করা যায় না। মা বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'শিব চাইলাম, এ যে দেখছি এক ভূত এসে জন্মালো'। কিন্তু অবাক কাণ্ড, শিবমন্ত্র জপে মাথায় একটু জল দিলেই বিলে একেবারে শান্ত।

ছোটবেলাতেই বিলের সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা ছিল। মাথায় সাধুদের মত জটা কেন হয় না। সেই নিয়ে চেঁচামেচি করে। সন্ন্যাসীরা আসলে কৈলাশের খবর জিজ্ঞাসা করে। পরণের কাপড় সন্ন্যাসী ভিখারীকে বিলিয়ে দেয়। ভারী ভাব আস্তাবলের কোচম্যানের সঙ্গে। বাবা বিশ্বনাথ দত্ত জিজ্ঞাসা করেন, "বড় হয়ে কি হবি রে বিলে?" বিলে উত্তর দেয়, "ঘোড়ার সহিস কি কোচম্যান হব।'

আমাদের এই অলস দেশ ত গাড়ীই, বিবেকানন্দই তা চালিয়ে ছিলেন। তিনিই আমাদের সহিস।

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথ দুঃসাহসী। ভয় কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। গঙ্গায় সঙ্গীদের নিয়ে বেড়াতে গেছেন, একটি ছেলে অসুস্থ হয়ে বমি করে ফেলল। মাঝিরা জুলুম করতে লাগল ছেলেরা বমি যদি পরিষ্কার না করে দেয় তবে তারা মারধোর করবে। নৌকা যখন প্রায় ঘাটের কাছে, তখন নরেন্দ্র এক লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন। কাছেই দুজন সাহেব যাচ্ছিলেন, বালক নরেন্দ্র ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে তাঁদের ঐ বিপদের কথা জানালেন। সাহেবরা ব্যাপারটা বুঝে মাঝিদের ধমক দিয়ে নরেন্দ্র ও তার বন্ধুদের ঐ জুলুমের হাত থেকে বাঁচালেন।

নরেন্দ্র যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র সেই সময় বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন হয়। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথের মত বক্তা তখন ভারতবর্ষেই কমই ছিল। তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন চারধার গম গম করত; লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত। স্যার সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার পর সভাপতি ছাত্রদের কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সামনে বক্তৃতা। ছাত্র কেন মাষ্টারমশাইদের বুক কাঁপতে থাকে। কোন ছাত্রই আর মুখ তুলে চাইল না। কিন্তু দেখা গেল নীচের ক্লাশের একটি ছোট ছেলে নির্ভীক মুখে গুটি গুটি পায়ে সামনে চলে আসছে। উঁচু ক্লাশের ছেলেরা, মাষ্টারমশায়রা অবাক হয়ে নরেন্দ্রর এই দুঃসাহস দেখতে লাগলেন। শুধু সাহস নয়, শক্তিও আছে নরেন্দ্রর। স্যার সুরেন্দ্রনাথের মত বাঘা বক্তার সামনে দাঁড়িয়ে সে একটানা কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করল। সুরেন্দ্রনাথ মহা খুশী, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ছোট ছেলেটি একদিন বড় হয়ে বিশ্ববাসীকে তার অমর বাণী শোনাবে।

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রের খুব স্মৃতিশক্তি। শিক্ষক মহাশয়েরা যা শেখাতেন, নরেন্দ্রের মনের মধ্যে তা গেঁথে থাকত। নরেন্দ্রের আর একটি ঝোঁক ছিল, সেটা হচ্ছে ব্যায়ামচর্চা। তিনি জানতেন দেহে যদি শক্তি না থাকে তবে মনও দুর্বল হয়ে পড়ে। মাত্র দশ বৎসর যখন বয়স তখনই নরেন্দ্র লাঠি খেলায় ওস্তাদ। ব্যায়াম প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে ঐ অল্প বয়সেই তিনি সেখানকার লোকের সঙ্গে লাঠি

খেলায় জিতেছিলেন। আর একবার কুস্তিতে জিতে তিনি একটি রূপোর প্রজাপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই পুরস্কারটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

ছেলেবেলায় ধর্মের দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল। ঈশ্বর কি আছেন? যদি থাকেন তবে তিনি দেখা দেন না কেন? এই প্রশ্ন তাঁর মনে সকল সময়ে জাগত। এই প্রশ্ন, তিনি সকলকে করেছেন। ব্রাহ্মধর্মের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গঙ্গার বজরার উপর উপাসনা করতে বসেছেন। নরেন্দ্র তাঁর কাছে গিয়ে ঐ প্রশ্ন করলেন, "আপনি যাঁর উপাসনা করছেন, সেই ঈশ্বরকে কি দেখেছেন?

দেবেন্দ্রনাথ কোন সোজাসুজি উত্তর দিলেন না, তাই নরেন্দ্রনাথের মন ভরল না, নরেন্দ্রনাথ তখন কলেজের ছাত্র। যুক্তিতর্কে সে সত্যকে খুঁজে বেড়ায়, সুতরাং এক সময়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রায় তার লোপ পেল। ঐ দুঃসময়ে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গেল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হলেন। তিনি মানুষ চিনতেন। নরেনকে দেখে বুঝলেন যে খাঁটি সোনা। ভোরে তোলা মাখনের মত খাঁটি। নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ সোজাসুজি উত্তর দিলেন, "হ্যা দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট করে সবসময় তাঁকে দেখছি।" নরেন্দ্র চমকে উঠলেন। এমন জোরের সঙ্গে এ কথা কখনো কেউ বলেন নি। বাড়ী ফিরে এলেন কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণের টান ছাড়তে পারলেন না। কে যেন তাকে জোর করে দক্ষিণেশ্বরে ঐ ঠাকুরের কাছে টেনে নিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি দীক্ষা নিলেন, সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন, তখন তাঁর নাম হল স্বামী বিবেকানন্দ। নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—"নরেন্দ্র কিন্তু জালা। ডোবা পুকুরের মধ্যে নরেন্দ্র হোল বড় দীঘি, যেমন হালদার পুকুর।'

এই বিবেকানন্দ নামই সারা পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছে। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পরে তাঁর সংসারে বড় আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হয়। মা কালীর কাছে প্রার্থনা করলে যদি তিনি দয়া করেন এই ভেবে তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালেন। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তিনি মায়ের কাছে গেলেন কিন্তু কিছুতেই অর্থ কামনা করতে পারলেন না। বার বার তিন বার গেলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে কিছুতেই টাকার কথা বলতে পারলেন না। তখন বুঝলেন সংসারের জন্য কামনা বাসনা তাঁর দ্বারা হবে না। অবশেষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদই মাথায় তুলে নিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর বাণী প্রচারের জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন। স্বামীজির অসীম জ্ঞান ও ভক্তির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক এসে তাঁর মুখে নতুন ধর্মের কথা, তাঁর উপদেশ শুনতে আসত। তাঁর কাছে এলেই প্রত্যেকটি মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত, প্রাণে পরম শান্তি পেত। স্বামী বিবেকানন্দ সকলকে শক্তিমান হতে, ভগবানের সন্তান 'মানুষকে' ভালবাসতে শেখাতেন। রাজা মহারাজ হতে দীনতম ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁকে গুরু বলে মেনেছিল।

পোরবন্দরের রাজা স্বামীজিকে বললেন, "আপনি মূর্তি পূজা করেন কেন? মূর্তি কি ভগবান?" স্বামীজি তার কথা শুনে দেওয়ালে টাঙানো রাজার একখানি ছবি নামিয়ে রাজার সামনে রাজকর্মচারীদের বললেন, তার উপর থুথু ফেলতে। রাজ্যের দেওয়ান বললেন, তা কি করে সম্ভব? এ তো মহারাজের ছবি।" স্বামীজি বললেন. "এটা কেবল ছবি মাত্র ; এর মধ্যে রাজা নেই, তবে তোমরা কেন আপত্তি করছ?" কিন্তু কেউ রাজি হল না। স্বামীজি এইবার রাজার দিকে ফিরে বললেন, "দেখুন মহারাজ এরা রাজার মূর্তির ভিতরে রাজাকে দেখছেন বলে মূর্তিটিতে থুথু ফেলতে পারে না। রাজার মূর্তির ভিতরে তারা যেমন রাজাকে দেখছে, আমিও তেমনি মূর্তির মধ্যে ভগবানকে দেখতে পাই।

এই ঘটনায় মহারাজের চৈতন্য হল. তিনি স্বামীজির নিকট দীক্ষা নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

সেই সময়ে আমেরিকার শিকাগো শহরে সর্বধর্ম মহাসভার আয়োজন হয়েছিল। হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে পাঠাবার জন্য মাদ্রাজের কয়েকজন শিষ্য এবং ভারতবর্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠিক করলেন। মাদ্রাজ বন্দর হতে জাহাজে চড়ে স্বামীজি আমেরিকা পৌঁছলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোর বিরাট ধর্ম সম্মেলনে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা উপস্থিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রথমেই সম্বোধন করলেন, "হে আমেরিকাবাসী ভাই ও ভগিনীগণ—" প্রচণ্ড করতালিতে তাঁর আবেগপূর্ণ আহ্বানে আমেরিকাবাসীরা তাঁকে স্বাগত জানাল। এক মুহূর্তেই তিনি আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করে নিলেন। এইভাবে স্বামীজি বিশ্ব সভায় ভারতের ধর্ম-আসন প্রতিষ্ঠিত করলেন। আমেরিকার বহু লোক স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনবার জন্য সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণেরা উদগ্রীব হয়ে উঠল। স্বামীজির একজন বড় শিষ্যা হলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই বিদেশিনী স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিয়ে ভারতের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

দেশে ফিরে এসে স্বামীজি সেবাধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। এই বেলুড় মঠ দেশ বিদেশের নরনারীর কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থান। এর পর যখন তিনি হিমালয়ে গিয়ে কিছুকাল নির্জনবাস করছিলেন, তখন কলিকাতয় প্লেগ আরম্ভ হয়। অসংখ্য লোক এই রোগে মারা যায়। বিবেকানন্দ দেশের যুবকগণকে রোগী ও আর্তজনের সেবায় আহ্বান জানিয়ে "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—এই বাণী শোনালেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই অকস্মাৎ এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন।

চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না

# ভারতপথিক রাজা রামমোহন



"হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।"

তারিণী দেবী তাঁর ছেলেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষকালে খুঁজতে খুঁজতে তাকে পাওয়া গেল বাড়ীর পাশেই কালী মন্দিরে। তারিণীদেবীর পিতা শ্যাম ভট্টাচার্য মা কালীর নিষ্ঠাবান ভক্ত। রোজই তিনি দেবীর পূজা শেষ করে তবে জলগ্রহণ করেন।

তারিণী দেবী দেখলেন, সেইখানে ঠাকুরের সামনের তামার পাত্র হতে তাঁর ছেলে মহানন্দে প্রসাদী বেলপাতা চিবোচ্ছে।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয় নাকি ঐ দৃশ্য দেখে রাগ করে তার মেয়েকে বলেছিলেন "তোর ছেলে বিধর্মী হবে। বিধর্মী হলেও তোর ছেলে অসাধারণ পণ্ডিত হবে, দেশজোড়া নাম হবে।"

পরবর্তী কালে বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। ঐ বেলপাতা চিবানো চঞ্চল ছেলেটি পরে বিখ্যাত হয়ে ছিলেন রাজা রামমোহন রায় নামে। এক নবধর্ম তিনি প্রচার করেছিলেন তার

নাম ব্রাহ্মধর্ম, আর সেদিনের দীনতা, ও কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে যাওয়া জাতিকে তিনি নতুন জীবন দান করেছিলেন জ্ঞান ও বিদ্যার শক্তিতে।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। রামমোহন তাঁর পিতা রামকান্ত রায়ের মধ্যম পুত্র।

দেখা গেল বালক রামমোহনের পড়াশুনোয় অদ্ভুত অনুরাগ। পাঠশালায় তিনি গুরু মহাশয়ের নিকট বাংলা পড়েন, আবার বাড়িতে ফিরে এসে ফারসী ভাষায় পাঠ নেন। পড়াশুনোয় তার অনুরাগ শুধু নয়, প্রতিভাও তার অসীম। মাত্র ন'বৎসর বয়সে তিনি আরবী শিখবার জন্য পাটনা যান। সেখানে তিন বৎসরের মধ্যেই ঐ ভাষা রপ্ত করে ফেলেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য আরবী আর সংস্কৃতভাষা তখন লোকে শিখত। মাত্র বারো বৎসর বয়সে রামমোহন সংস্কৃত শিখতে কাশী যান। সেখানে শুধু ভাষা শিক্ষা নয়, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি বিষয়েও তিনি জ্ঞানলাভ করেন। উপনিষদ পড়বার কালেই তাঁর মনে ধারণা হয়েছিল, মূর্তি পূজার কোন প্রয়োজন নেই। কাশী হতে ফিরে আসবার পরই তার পিতার সঙ্গে বিবাদ বাধল। ইসলাম ধর্ম আলোচনা করে তিনি 'ঈশ্বর এক' এই সত্য অনুভব করেছিলেন আর হিন্দুশাস্ত্রের বেদান্ত পাঠ করে মনে হল ঈশ্বর নিরাকার, তাঁর কোন রূপ নেই। তাই হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তিনি পুস্তিকা রচনা করলেন। পিতা পরম হিন্দু সুতরাং তাঁর সঙ্গে রামমোহনের মতবিরোধ দেখা দিল। রামমোহন গৃহত্যাগ করে নানা দেশে ঘুরে ধর্মের প্রকৃত সত্যকে খুঁজতে লাগলেন। তখন তার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত তত্ত্বকে জানবার জন্য রামমোহন তিব্বতে গেলেন। সেখানে গিয়ে রামমোহন দেখলেন ধর্মরাজ লামাই তিব্বতীদের একমাত্র ঈশ্বর, তিনিই ঈশ্বরের অবতার। রামমোহন এই মানুষ পূজার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন। পুনরায় রামমোহন পিতার আদেশে ঘরে ফিরে এলেন। গৃহে ফিরে এসে রামমোহন ইংরাজী, ফার্সি, উর্দু, গ্রীক ও হিব্রু প্রভৃতি শিখে ফেললেন।

রামমোহনের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর। রামমোহনের পিতা মাতা আশা করেছিলেন এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার পর নিশ্চয়ই ছেলের মত বদলাবে। কিন্তু শত বিপদ রামমোহনকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। বাড়ী ফিরে তিনি আগের মতই হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নানা রকম তর্ক চালাতে লাগলেন। এই দেখে তাঁর পিতা আবার তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এর কিছুকাল পরেই পিতার মৃত্যু হয়। পিতার সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্যতা বিধর্মী পুত্রের নেই—হাইকোর্টে মামলা চলে। এমন কি মা পর্যন্ত পুত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। রামমোহন মামলায় জয়ী হলেন কিন্তু সম্পত্তি নিলেন না, মাকে দিয়ে দিলেন। পুত্রের মহত্বের কাছে মা হার মানলেন।

রামমোহন রায় ছিলেন একাধারে তেজস্বী পুরুষ ও পণ্ডিত। সরকারী চাকরী নিয়ে তিনি রংপুরে চলে গেলেন। তেরো বৎসর সুনামের সঙ্গে চাকরি করে তিনি আবার ফিরে এলেন।

চাকরি থেকে অবসর পেয়ে চল্লিশ বৎসর বয়সে রামমোহন কলকাতায় বাড়ী কিনে বাস করতে লাগলেন এবং দেশের নানাবিধ কুসংস্কার দূর করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

রামমোহন রায় "আত্মীয় সভা" নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সভায় ভগবানের উপাসনা হত। এর পর কয়েকজন শক্তিশালী লোকের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে রামমোহন 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এখানে সকল মানুষের দুয়ার খোলা ছিল। ছোঁয়াছুয়ি বা জাতিধর্মের বাধা এখানে ছিল না। রামমোহন বুঝেছিলেন সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি ধর্মকে দুর্বল করে দেয়—প্রকৃত ধর্মে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত নূতন ধর্ম কাউকেও বাদ দিয়ে নয়, সকল মানুষকে নিয়ে।

রামমোহনই প্রথম বাংলা খবরের কাগজ বার করেন। এই কাগজটির নাম ছিল 'সংবাদ কৌমুদী।' রামমোহন দেশের জন্য অনেক ভাল কাজ করে ছিলেন, তাহার মধ্যে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে সতীদাহ নামে এক নিষ্ঠুর প্রথা ছিল। সেকালের বাঙলার ঘরে ঘরে ঐ নিষ্ঠুর ব্যাপার ঘটত। কোন স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী জীবিত থাকলে স্বামীর সঙ্গে তাকে সহমরণে যেতে হত। যখন মৃতদেহকে সাজিয়ে চিতায় আগুন দেওয়া হত তখন সেই জলন্ত চিতায় স্ত্রীকে প্রবেশ করে জীবন্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে হত। এই নিষ্ঠুর প্রথা কেবল বঙ্গদেশে নয়, ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। রামমোহন রায় শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করলেন যে সতীদাহ ন্যায়, ধর্ম ও বিবেকবুদ্ধি বিবর্জিত একটি অমানুষিক নিষ্ঠুর প্রথা। লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায় তিনি আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ দেশের শিক্ষার জন্যও রামমোহন রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হলে এদেশের লোক বহুদিক দিয়ে উপকৃত হবে এটা তিনি বুঝলেন। তাই ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি বিদেশী, এদেশে যখন ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করতে চাইলেন তখন রামমোহন তাঁদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্যও রামমোহনের আগ্রহ ও উৎসাহের সীমা ছিল না।

আমরা এখন যে গদ্যভাষায় প্রচুর বই পড়তে পাই, তারও মূলে রামমোহন রায়। বাংলা গদ্যের একটি সরল অথচ দৃঢ় ভাব এনে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরেজরা এদেশে এসে অনেক রাজ্যের শাসন ভার নিজেরা নিয়েছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুরশাহকে নিজের রাজ্য ইংরাজদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তাঁর বদলে তিনি ইংরেজদের কাছে থেকে বৃত্তি পেতেন। ঐ বৃত্তির টাকা যাতে কিছু বাড়ে তার জন্য বাদশাহ ঠিক করলেন কোন উপযুক্ত লোককে বিলাতে পাঠাবেন। রামমোহনের মত উপযুক্ত লোক পেয়ে বাদশাহ আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তিনি রামমোহনকে "রাজা" উপাধি দিয়ে সম্মান দেখালেন এবং ঐ কাজের ভার দিয়ে বিলেতে পাঠালেন। বিলেতের ব্রিষ্টলে এক বন্ধুর বাড়ী থাকবার কালে তিনি জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর বিদেশী বন্ধুরা সেবা শুশ্রূষা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি ব্রিষ্টল শহরে দেহত্যাগ করেন। অপূর্ব চরিত্রের অপূর্ব মৃত্যু।

রাজ রামমোহনের মত শক্তিমান পুরুষ সে যুগে আর কেউই ছিল না।

**সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি ধর্মকে দুর্বল করে দেয়।**

# দার্শনিক ও দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ



অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার !
"হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণী-মূর্তি তুমি।
তোমা লাগি নহে মান, নহে ধন, নহে সুখ ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই, কোন ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।"

১৯০৮ সালের কলকাতা। গ্রে ষ্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়ী পুলিশ মধ্যরাত্রিতে ঘেরাও করেছে। পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট ক্রেগান সাহেব দলবল নিয়ে স্বয়ং এসেছেন।

সারা বাড়ী তল্লাস করে ছোট ভাই-এর লেখা একখানি পোষ্টকার্ডের চিঠি ছাড়া সেখানে আর কিছুই পাওয়া গেল না। তবুও হাতকড়া পরিয়ে লোকটিকে লালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হল, তার পর কোর্টে, সেখানে তার কারাবাসের আদেশ দেওয়া হল।

যাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ঋষি অরবিন্দ।

শুধু ধনী নয় পাকা সাহেব ছিলেন ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। তাঁরই পুত্র অরবিন্দ ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অরবিন্দের জননী ছিলেন মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবী।

পিতার আগ্রহে অরবিন্দ বাল্যকাল থেকেই বিদেশী আবহাওয়ায় মানুষ হন। প্রথম দিকে

তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় দার্জিলিং-এর সেন্ট পল্‌স বিদ্যালয়ে। যখন তাঁর সর্বমাত্র সাত বৎসর বয়স তখন তিনি পিতার সঙ্গে বিলেতে চলে যান। পড়াশুনোর বাকি কালটা বিলেতেই কেটে যায়। যেখানে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি 'ট্রাইপেজ' পরীক্ষা পাশ করেন। খুব ভাল ছাত্র ছাড়া এই পরীক্ষায় কেউ পাশ করতে পারে না।

মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে আই-সি-এস পরীক্ষায় পাশ করলেন অরবিন্দ। তাঁর স্থান ছিল চতুর্থ, কিন্তু গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি এত বেশী নম্বর পেলেন যা তার পূর্বে আর কেউ পায় নি। পিতার ইচ্ছা ছিল অরবিন্দ এদেশে এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মানীয় পদে কাজ করবেন। কিন্তু পরীক্ষা দিলেও ইংরাজের অধীনে কাজ করা অরবিন্দের ভাল লাগল না। তাঁর মনে হতে লাগল সকলের অপেক্ষা বড় কাজ হল দেশের সেবা। তাই ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় হাজির না হয়ে সোজা হাজির হলেন মাতৃভূমি বঙ্গদেশ। বিলেত ফেরত আই-সি-এস তিনি হলেন না। চৌদ্দ বৎসর বিলাতে থেকে তিনি বাংলা মায়ের কোলে ফিরে এলেন। তখন তাঁর গায়ে প্যান্ট কোট নেই, পরনে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, পায়ে নাগরা জুতো।

বরোদা রাজ্যের গাইকোয়াড়ের সঙ্গে বিলেতে অরবিন্দের বন্ধুত্ব হয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষের গুণাগুণ গাইকোয়াড় ভাল করেই জানতেন। তাই এদেশে ফিরে আসবার পরই তিনি তাঁকে তার রাজ্যে ডেকে নিলেন। সেখানে নানা বিভাগে কাজ করবার পর তিনি বরোদা কলেজের সরকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন।

বরোদায় কাজ করবার সময়ই অরবিন্দ বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার ফলে তিনি বাংলা ভাষা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত অরবিন্দ পড়াশুনোয় ডুবে থাকতেন। তাই শুধু বাংলা ভাষা শেখা নয়, বাল্মীকির রামায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিবেকানন্দের লেখার তিনি একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠলেন। অরবিন্দের বিলাসিতার বালাই ছিল না। বরোদার হাজার টাকা যখন তাঁর বেতন, তখন তিনি লোহার খাটে সাধারণ বিছানায় শুতেন, সাধারণ একখানি আলোয়ান শীতের দিনে তাঁর গায়ে থাকত।

বরোদায় থাকবার সময়ে লোকমান্য তিলকের সঙ্গে অরবিন্দের বন্ধুত্ব হয়। বরোদায় থাকতেই তিনি এক মহারাষ্ট্রীয় যোগীর নিকট যোগ-শিক্ষা শুরু করেন।

কিন্তু ধ্যানের মধ্যে ডুবে থাকার তখন সময় নয়। সামনে বিরাট কাজ পড়ে আছে—দেশকে স্বাধীন করবার কর্ম। অরবিন্দ বরোদা থেকে বঙ্গদেশে ফিরে এলেন।

বিদেশীদের হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য বঙ্গদেশ তখন টলমল। লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। বঙ্গদেশকে দুভাগে ভাগ করা হবে—এ আদেশ তিনি জারি করেছেন। সারা বঙ্গদেশে

তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। বঙ্গভঙ্গ রোধ করতেই হবে। আকাশ-বাতাস তখন 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত।

মনীষি বিপিনচন্দ্র পালের 'বন্দে মাতরম' সংবাদপত্রে যোগ দিলেন অরবিন্দ, তাঁর রচনা পাঠ করে দেশবাসী জেগে উঠল। কলকাতায় একটি জাতীয় কলেজ স্থাপিত হল, তার অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় কাজ করবার সময়ে রাজদ্রোহের অপরাধে অরবিন্দ অভিযুক্ত হলেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি পেলেন। এর পরের বছর পুলিশ তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করল। সেই সময়ে বাংলার একজন বিপ্লবী যুবক বোমা ও পিস্তলের সাহায্যে এদেশের ইংরাজদের তাড়াবার পণ করেছিলেন। এই দলের নেতা ছিলেন অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। মজঃফরপুরের অত্যাচারী জেলার কিংসফোর্ডের উপর বিপ্লীদের প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। তাকে হত্যা করতে গিয়ে গাড়ীতে বোমা ফেলেও বিফল হলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এই ব্যাপারে মানিকতলার মুরারীপুকুর বাগানে বারীন্দ্রকুমার সমেত বহু বিপ্লবী ধরা পড়েন। হয়ত অরবিন্দের কোন সম্পর্ক রয়েছে ঐ ভাই-এর বিপ্লবীদের দলের সঙ্গে, এই ভেবে গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে পুলিশ অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করল।

তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বন্ধন শৃঙ্খল তার, চরণ বন্দনা করি, করে নমস্কার, কারাগার করে অভ্যর্থনা।

বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা শুরু হল। অরবিন্দের তখন মামলা চালাবার মত অর্থ হাতে নেই। ঠিক সেই সময়ে তরুণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। চিত্তরঞ্জনকে দেখে অরবিন্দ বলেছিলেন "স্বয়ং নারায়ণ আমার সাহায্যে এসেছেন।"

সরকার পক্ষের সমস্ত যুক্তি একে একে খণ্ডন করে চিত্তরঞ্জন বললেন, 'আজ যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে—তাঁকেই একদিন দেশপ্রেমিক বলে সারা ভারত পূজা করবে। দেশবন্ধু প্রমাণ করলেন অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

যখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এলেন অরবিন্দ, তখন দেশের অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। তার পরিচিত অন্তরঙ্গরা সকলেই প্রায় জেলে। বিপ্লবীরা বন্দী, ফলে নরমপন্থী দলের ভীড় বেশী স্বদেশ সেবার ক্ষেত্রে। অরবিন্দ ভাবলেন দেশকে আবার নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। কারাগারের অন্তরালে অরবিন্দ যতদিন ছিলেন তখন তিনি যোগ সাধনা করতেন। সেখানে ধ্যানের মধ্যে ভগবানের বাণী পেয়েছিলেন। মানুষের আত্মার শক্তি কত বড় তা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। ধ্যানের মধ্যে পাওয়া নূতন বাণী তিনি সকলকে শোনাতে চাইলেন। 'ধর্ম' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক ও 'কর্মযোগিন' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি দেশ গঠনের আদর্শ দেশের লোকের নিকট প্রচার করতে লাগলেন।

অরবিন্দ তাঁর কারাজীবনের কাহিনীতে এক জায়গায় লিখেছেন, "বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পেলাম।" কারাগারে যোগসাধনায় তিনি যে ভগবানের অনুভূতি পেয়েছিলেন তাতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাতি যদি মহান না হয় তবে সেই জাতি নিজের ও পরের মঙ্গল করতেপারে না। তাঁর মনে এই সত্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ ধন হচ্ছে তার নিজস্ব ধর্ম। ধর্মের পথেই একদিন প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে।

রাজনীতির কোলাহলকে পেছনে ফেলে রেখে অরবিন্দ সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করে নিলেন। পণ্ডিচেরির জনহীন সমুদ্রতীরে ঋষি অরবিন্দের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল। সেই আশ্রমে যে কোন দেশের যে কোন ধর্মের লোকের প্রবেশের সমান অধিকার ছিল। দেশ বিদেশের অসংখ্য লোক এসে অরবিন্দের শিষ্য হল, আশ্রম হয়ে উঠল একটি পুণ্যক্ষেত্র। অরবিন্দের মৃত্যুর পর আশ্রম যিনি পরিচালনা করতেন তিনি শ্রীমা, দেশের এক বিদুষী মহিলা।

হৃদয়ের শক্তিকে অরবিন্দ সকলের চেয়ে বেশী মূল্য দিতেন। একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করবার বল আমার আছে; শারীরিক বল নয়, জ্ঞানের বল। তরবারি বা বন্দুক নিয়ে আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না।"।

এই দার্শনিক যোগী অক্ষয় জীবনের সাধনায় ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর দেহত্যাগ করেন।

---

**জাতি যদি মহান না হয় তবে সেই জাতি**
**নিজের ও পরের মঙ্গল করতে পারে না।**

দয়ার সাগর ও সমাজ সংস্কারক —

# দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর



"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত জগতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু !"

মেদিনীপুর জেলার একটি ছোট গ্রামের নাম বীরসিংহ। এই গ্রামেরই এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন হাট থেকে ফিরে এসে পিতার কাছে শুনতে পেলেন তাঁদের পরিবারে একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।

ঐ এঁড়ে বাছুরটিই হলেন আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলাদেশে তার মত আর একটি লোক আজও জন্মায় নি।

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ও গোঁয়ার ছিলেন। তাঁর পিতামহের দেওয়া এঁড়েবাছুর নাম মিথ্যে হয় নি। ছেলেবেলায় তাঁর দুরন্তপনায় বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণপরিচয়' বই-এ রাখালের গল্পে লেখা আছে রাখাল অতি দুরন্ত বালক। শিশুকালে তিনি রাখালের মতই দুর্দান্ত ছিলেন। কিন্তু দুষ্টামি করলেও লেখাপড়াতে তাঁর ছিল দারুণ আগ্রহ। গ্রামের পাঠশালার পড়া তিনি কয়েকবছরের মধ্যে শেষ করে ফেললেন।

হাতে টাকা নেই, কিন্তু ঠাকুরদাস হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন না। শুভক্ষণ দেখে একদিন ছেলের হাত ধরে তিনি হাঁটা পথে কলকাতায় রওনা হলেন।

বীরসিংহ গ্রাম হতে কলকাতা অনেক দূরের পথ। পথের মাঝে মাঝে পাথরে খোদাই করা মাইলের অঙ্ক ইংরাজীতে লেখা আছে। একে বলে মাইলষ্টোন। মাইলষ্টোনের উপর লেখা অঙ্কের সংখ্যাগুলি বালক ঈশ্বরচন্দ্রের লক্ষ্য এড়ায় নি। দেখা গেল কলকাতায় পৌঁছোবার আগেই ইংরাজী অঙ্কের সংখ্যা ঈশ্বরের শেখা হয়ে গিয়েছে।

কলকাতায় এসে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। দরিদ্র গৃহ. ঈশ্বরচন্দ্রকে যে কত কষ্ট সহ্য করে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে বলে শেষ করা যায় না। রোজ তিনি বাজার করে মসলা বেটে, রান্না করে বাবা ও ভাইদের খাইয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে কলেজে আসতেন। ঠাকুরদাস কিছুকাল পরে তাঁর অন্য দুটি ছেলেকেও কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। অভাবের সংসার, তাই ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হত। কিন্তু একদিনের জন্যও লেখাপড়ায় তিনি অমনোযোগী হন নি। কখনো কখনো তাকে দেখা যেত বিদ্যালয়ের পথে যেতে যেতে তিনি পাঠ ঠিক করে নিচ্ছেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়ে পড়াশুনোয় শিক্ষকদের একের পর এক অবাক করে দিতে লাগল, পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অজস্র পুরস্কার পেতে লাগল, তখন অনেক লোক তার ভক্ত হয়ে উঠল। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সহপাঠীদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। নিজে না খেয়ে কোন দরিদ্র সহপাঠীকে তিনি খাওয়াচ্ছেন এই দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত। তিনি যে পরবর্তীকালে দয়ার সাগর বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তার শুরু এই ছাত্রজীবন থেকেই।

শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন সার্টিফিকেট লাভ করেন তখন তার বয়স মাত্র কুড়ি। বিদ্যাসাগর উপাধি তাঁর আগেই পাওয়া।

লেখাপড়া শেষ হল, এবার উপার্জনের পালা। সে কালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিদেশী রাজকর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শেখানো হত। এই কলেজে তিনি প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগদান করলেন। বেতন পঞ্চাশ টাকা। এর পর কিছুদিন তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারি রূপে কাজ করেন কিন্তু উপরওয়ালাদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় পদত্যাগ করেন। এর পর কিছুদিন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'হেড রাইটার', সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে কাজ করেন। তারপর সরকার তাকে 'বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক' পদে নিয়োগ করেন। এখানে দীর্ঘদিন যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে উপরওয়ালার সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তিনি এই কাজও ছেড়ে দেন। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। পাঁচশত টাকার এই চাকুরী ছেড়ে তিনি বলেছিলেন, "কেন? দরকার হলে আলু পটল বেচে পেট চালাব।" পৃথিবীতে কোন অন্যায় তিনি সহ্য করতেন না, তিনি প্রবল প্রতিবাদ করতেন।

বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরের মত মহাপুরুষ কখনো জন্মায় নি। এ দেশের লোকের মঙ্গলের জন্য তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না। এদেশে তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, বিদ্যাসাগর মেয়েদের

লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিভিন্ন জেলায় বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর একটি বড় কীর্তি হচ্ছে 'মেট্রোপলিটান কলেজ' যা এখন বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত। দেশের ছেলেরা যাতে সহজে শিক্ষালাভ করে তার জন্য তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখা 'বর্ণ পরিচয়' 'বোধোদয়' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদি' পড়ে নি এমন লোক খুব কমই আছে। বিদ্যাসাগরই প্রথম পথ দেখান কি ভাবে সুন্দর করে বাংলা লেখা যায়।

বিদ্যাসাগর বিদ্যার যেমন সীমা ছিল না, দয়ারও তেমনি শেষ ছিল না। অপরের দুঃখ দেখে তিনি এত কাতর হয়ে পড়তেন, যে সব কাজ ফেলে সেই দুঃখ ঘুচাবার চেষ্টা করতেন। এই জন্যই এদেশের মানুষ তাকে 'দয়ার সাগর' নাম দিয়েছিল। সে কালে বঙ্গদেশে এমন লোক ছিল না যে বিদ্যাসাগরের কাছে থেকে উপকার পায় নি। কতদিন তিনি গঙ্গাস্নান করে নিজের কাপড়খানি কোন দরিদ্রকে দান করে কেবল গামছা পড়ে বাড়ী ফিরে এসেছেন। পথের মধ্যে কলেরা রোগে পীড়িত হয়ে—কে একজন ছট্‌ফট্‌ করছে। রাজপথে শত শত লোক একবার চেয়ে দেখে চলে যাচ্ছে। মৃত্যু আসন্ন। এমন সময় দেখা গেল কে একজন এসে মল-মূত্র মাখা অবস্থায় রোগীটিকে পরম যত্নে তুলে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটলেন। লোকটি আর কে? বিদ্যাসাগর! অপরের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত, তাই বালিকা-বিধবাদের দুঃখ দেখে তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। তার তেজস্বী হৃদয়ের মধ্যে এমন গভীর স্নেহ কিভাবে থাকত তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর উপার্জনের সব টাকাই দুঃখীর দুঃখ দূর করার কাজে ব্যয় হয়ে যেত।

বিদ্যাসাগর ছিলেন খাঁটি বাঙালী। চিরদিন তিনি গায়ে মোটা চাদর দিয়ে, চটি জুতো পায়ে দিয়ে চলাফেরা করতেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন কিন্তু চিরদিন সাদাসিধা জীবন চালিয়েছেন। বাঙালীর এই সাধারণ বেশভূষায় তিনি গৌরব অনুভব করতেন। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁর বন্ধু ছিলেন, চটি পায়ে চাদর গায়ে দিয়েই তাঁর বাসভবনে তিনি প্রায়ই গল্প করতে যেতেন।

কোন কাজকেই বিদ্যাসাগর ছোট মনে করতেন না। কোন লোককেও তিনি ছোট বলে ভাবতেন না। পথে যাবার সময়ে ক্লান্ত মজুরের মাথা হতে মোট নিজের মাথায় করে নিয়েছেন। মেরুদণ্ডহীন পরমুখাপেক্ষী লোককে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। শোনা যায়, একবার বর্ধমান ষ্টেশনে এক বিলাসী যুবক তার ছোট একটি সুটকেস নিয়ে যাবার জন্য 'কুলি, কুলি' করে হাঁকডাক করছিল। বিদ্যাসাগর নিজেকে কুলি বলে পরিচয় দিয়ে তার সুটকেসটি মাথায় করে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। যুবকটি বিদ্যাসাগরের বেশভূষা দেখে তাকে কুলি বলেই ভেবেছিল। তার পর যখন পরিচয় পেল যে কুলিটি আর কেউ নয়, বিদ্যাসাগর, তখন তার লজ্জার অবধি রইল না। এই ভাবেই বিদ্যাসাগর তাকে 'স্বাবলম্বন' শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির তুলনা ছিল না। ঠাকুর-দেবতা অপেক্ষাও তিনি মাতা-পিতাকে

বেশী ভক্তি করতেন। কাশীতে তিনি এক পণ্ডিতকে তাঁর মাতা-পিতাকে দেখিয়ে বলেছিলেন' "এঁরাই আমার অন্নপূর্ণা আর বিশ্বেশ্বর। এর ছাড়া আমার আর কোন অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর নেই।" মাতা পিতার মৃত্যুতে তিনি শোকে আকুল হয়ে শিশুর মত কেঁদে ভাসিয়েছিলেন।

মহামানব সেই মানুষকেই বলা হয়, যার মধ্যে মানুষের সকল গুণ পরিপূর্ণভাবে দেখা যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনে ঐরূপ মানবতার চরম বিকাশ ঘটেছিল বলে তিনি এ যুগের মহামানব। আমাদের মত কর্মহীন, দাম্ভিক, দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের মত মহামানব কিভাবে আবির্ভূত হলেন তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। বজ্র অপেক্ষা কঠোর, কুসুম অপেক্ষা কোমল হৃদয় মানুষটির যে বলিষ্ঠ মন ও অপার কর্মশক্তি ছিল তা এ দেশবাসীর মধ্যে দেখা যায় না।

যাহা অন্যের নিকট অসম্ভব, তাকে তিনি সম্ভব করে তুলতেন। কোন ভয় বা প্রলোভন, তাঁর কোন সাধু সংকল্প হতে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি।

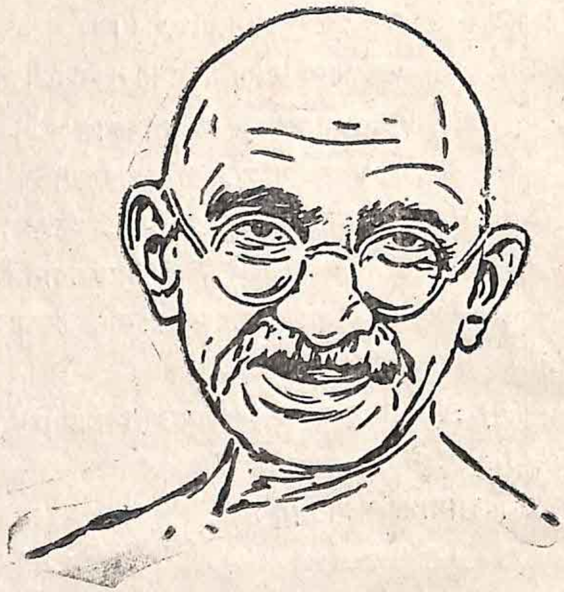
সারা জীবন দুঃখীর দুঃখ ঘুচিয়ে নিজে দুঃখ বরণ করে করুণাসাগর বিদ্যাসাগর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর জন্মায় নি।

---

**কোন কাজই ছোট মনে করা উচিত নয়।**

# জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী



"আমার জীবনই আমার বাণী"

পূর্ববঙ্গে নোয়াখালির একটা দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রাম। কিছুদিন আগেই সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে, এখন নির্জন শশ্মানের মত গ্রামখানি পড়ে রয়েছে। সেখানে শীর্ণ দেহ নিয়ে, লাঠিতে ভর করে, বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে, কচুরীদাম আর ভিজা মাটির গন্ধের মধ্য দিয়ে এক অপরিচিত পথ ধরে গান্ধীজি চলেছেন। তাঁর কাজ, যে হিন্দু মুসলমান তুচ্ছ কারণে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তা রোধ করা। বাংলা ও বিহার এই দুই স্থানের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে আবার তাদের মধ্যে সম্প্রাতি ফিরিয়ে আনবার কাজ তিনি প্রধান ব্রত বলে গণ্য করে সুদূর দিল্লী হতে চলে এসেছেন। এ পথে বাধা ও বিপদ যথেষ্ট ছিল, নিজের প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু গান্ধীজি মৃত্যুকে কখনো ভয় করেন নি। আদর্শের কাছে কোন বিপদকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না—এমন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাঁর পূর্বে ভারতে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি।

অহিংসা ও প্রেমের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম তাঁর পূর্বে পৃথিবীর আর কেউ জানত না। গান্ধীজি ভারতীয়দের মধ্যে শুধু জাতির জনক নন তিনি ভারতের মুক্তিদাতা। তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে ভারতের পরাধীনতা ঘুচত না।

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। গুজরাটের পোরবন্দর নামক স্থানে এক বণিক বংশে গান্ধীজির জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী ও মাতার নাম পুতলী বাই। গান্ধীজি পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন সত্যের প্রতি অনুরাগ, আর দয়া, ক্ষমা ও ধর্মপ্রবণতা মাতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেন গান্ধীজি। তার পর বিলাতে পড়াশুনা করে ব্যারিষ্টার হবার জন্য সাগর পাড়ি দিলেন। ব্যারিষ্টার হবার পর প্রথমে বোম্বাই শহরে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু বেশীদিন সেখানে তিনি থাকলেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকাতেই মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মত বর্ণবিদ্বেষ সেকালে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ছিল না। ইউরোপের শ্বেতকায় সাহেবরা সেখানকার কৃষ্ণকায় জাতকে শুধু ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল তাই নয়, তাঁদেরকে পশু অপেক্ষাও অধম বলে মনে করত। সেখানে ভারতবাসীদের অবস্থা ঐ কৃষ্ণকায় জাতিদের মতই ছিল। ইংরেজেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের কুলী বলে মনে করত, তাই নবীন ব্যারিষ্টার গান্ধী যখন সেখানে গেলেন তখন তিনি তাদের নিকট কুলী ব্যারিষ্টার নামেই পরিচিত হলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ দেখে গান্ধীজি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেখানে শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের সঙ্গে অশ্বেতাঙ্গগণ ট্রামেবাসে এক আসনে বসতে পায় না, এক পাড়ায় থাকতে পারে না। এমন কি সাহেবরা যদি একজন কালা আদমীকে খুন করেও ফেলে তবু তার শাস্তি হবে না। ঐ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই কুলী ব্যারিষ্টারের জীবন বহুবার বিপন্ন হয়েছিল, বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। সেখানে গান্ধীজি ভারতীয়দের অধিকার যাতে বজায় থাকে তাঁর জন্য অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করলেন। এর ফলে দীর্ঘ সংগ্রামের পর তিনি ভারত ও আফ্রিকার নির্যাতিত জাতিকে সেখানে মানুষের মত সম্মান নিয়ে বাঁচবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। দীর্ঘ একুশ বৎসর নাটালে ছিলেন গান্ধীজি। এইখানেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুত হবার মত শক্তি অর্জন করেন।

১৯১৪ সালে গান্ধীজি আফ্রিকার কাজ শেষ করে যখন দেশে ফিরে আসেন তখন আমাদের দেশ কেবল পরাধীন নয় অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। গান্ধীজি একই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলেন। তিনি দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন কোন একজনকে ছুঁলে কারও পাপ হয় না বা জাত যায় না। ভারতের অবহেলিত যে অস্পৃশ্য সমাজ তাঁদের গান্ধী নাম দিলেন 'হরিজন', অর্থাৎ হরির আপনার জন। এইভাবে গান্ধীজি সকল মানুষই যে মানুষ, কেউ বড় কেউ ছোট নয়, এই সত্য প্রচার করলেন। সারা দেশবাসী নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার বিভেদ ভুলে এক হতে লাগল। অস্পৃশ্যতা দূর করা

ছাড়াও গান্ধীজির দ্বিতীয় ব্রত হল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। ইংরাজ শাসনকর্তাদের বিভেদ সৃষ্টির ফলে ভারতের হিন্দু মুসলমান যে একই মায়ের সন্তান, তারা যে ভাই ভাই, সে কথা ভুলে গিয়েছিল। গান্ধীজি তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য আনলেন। তারপর পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর হাতে তুলে দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অভিনব অস্ত্র—'অসহযোগ আন্দোলন।'

তার কিছুকাল আগেই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের অহিংস জনতার উপর ইংরাজরা নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়। ঐ নিষ্ঠুরতা দেখে পরাধীন জাতির বেদনা গান্ধীজিকে দারুণ ব্যথিত করে তুলেছিল, তাই ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজির মনে কোন দ্বিধা ছিল না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতকে ইংরাজদের শাসন হতে মুক্ত করতে হবে।

অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের সকল প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক সাড়া দিল। "আমরা গান্ধী মহারাজের শিষ্য, কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব"। ঘরে ঘরে চরকায় সূতো কেটে বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে সকলে খদ্দরের কাপড় পরতে লাগল। বিদেশী জিনিস সম্পূর্ণ বর্জন করা হল। ইংরাজ সরকার নির্মম অত্যাচার করে এই আন্দোলন দমন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ কি কারো শাসন মানে?

জাতির শক্তি যাতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দৃঢ় হয় সেই জন্য ১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবন আইন আন্দোলন শুরু করলেন। তখন এদেশে লবন তৈরী করা বে-আইনী ছিল। বোম্বাই প্রদেশে ডাণ্ডীতে তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করতে যে পদযাত্রা করেন, তাহাই 'ডাণ্ডি অভিযান' নামে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলে ছিলেন 'আমি যখন যাত্রা শুরু করব, সারা ভারত সাগর তরঙ্গের মত উত্তাল হয়ে উঠবে।' এর পর বিলাতে এক গোলটেবিল বৈঠক বসে, ভারতকে শাসনকার্য পরিচালনার কিছু অধিকার দেবার জন্য। কিন্তু ভারতের কোন উন্নতি বা স্বাধীনতা দেবার কোন লক্ষ্যই ছিল না এই বৈঠকে। গান্ধীজি ইংরাজদের ছদ্ম সহানুভূতি দেখে হতাশ মনে দেশে ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল ১৯৪২ সালে। গান্ধীজি এই সময়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করলেন। মহাযুদ্ধে ইংরেজরা নানা অস্ত্রে তখন সজ্জিত। তাদেরই সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে তাদের ভারত ছাড়তে বলা, প্রচণ্ড দুঃসাহসের পরিচয়। সমগ্র ভারত এই আন্দোলনে চঞ্চল হয়ে উঠল। গান্ধীজিকে তার সহকর্মীদের সঙ্গে কারারুদ্ধ করা হল। কিন্তু বন্যার মত ঐ দুর্বার আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করলে কি হবে? ইংরাজ জাতি বুঝতে পারল তাদের পায়ের তলার মাটি আলগা হয়ে গেছে। এ দেশে রাজত্ব করার দিন শেষ হয়ে আসছে। শেষবারের মত ইংরাজরা চেষ্টা করল, কৌশলে ভারতকে আবার দুর্বল করা যায় কিনা।

নানা উপায়ে ইংরাজরা চিরদিন ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এ জাতিকে

দুর্বল করে রাখত। সুতরাং তাদের কৌশল ব্যর্থ হল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট শুরু হল এদেশে ভ্রাতৃহত্যার তাণ্ডবলীলা। বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা দেশ ভেসে গেল। কলকাতা ও নোয়াখালিতে যে হত্যাকাণ্ড ঘটল সে বর্বর ঘটনার তুলনা ইতিহাসে নেই।

যে স্বপ্ন গান্ধীজি এতদিন দেখে এসেছেন, আজ সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হল। গান্ধীজি বুঝতে পারলেন দুর্বল জাতি মুহূর্তের মধ্যে হিংসার আশ্রয় নেয়। গান্ধীজি কোন দিন ভেঙ্গে পড়েন নি, বা কোন কাজ ব্যর্থ হতে দেন নি। কলকাতা ও নোয়াখালিতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শান্তি যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে চলল কিছু অনুগামী ভক্ত। নোয়াখালির আগুন নিভতে না নিভতেই বিহারে আগুন জ্বলে উঠল। সর্বত্রই গান্ধী গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে শান্তি, অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। আগুন নিভল আর সেই সাথে দ্বিধা বিভক্ত ভারতের মাটিতে ইংরাজ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি করে গেল।

গান্ধীজির কাজ তখনো ফুরোয় নি। তখনো এ দেশের হিংসার নিভানো আগুনের স্ফুলিঙ্গ রয়ে গিয়েছে। মানুষে মানুষে স্বার্থত্যাগ করে সব ভুলে পরস্পরকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে, সেই ভালবাসার মন্ত্র গান্ধীজি দেশবাসীর কাছে শোনাতে লাগলেন।

কিন্তু এ জন্য তাঁকে পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হল। এক ভ্রান্ত যুবকের গুলির আঘাতে দিল্লীর প্রার্থনা সভায় যাবার পথে গান্ধীজির মৃত্যু ঘটল। সেই দিনটা ছিল ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ সাল।

গান্ধীজি আমাদের শিখিয়েছেন হিংসায় কোন মহৎ কাজ হয় না। মানুষের ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। শিখিয়েছেন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান এই যে সব বিভেদ আমাদের সমাজে রয়েছে তার মূলে কোন সত্য নেই। মানুষ মানুষই, ভগবানের যেমন জাত নেই তেমনি মানুষেরও নেই। এই সকল সত্যই তিনি তাঁর জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন। তাই তিনি বলে গিয়েছেন, "আমার জীবনই আমার বাণী"।

---

হিংসায় কোন মহৎ কাজ হয় না।

দেশবরেণ্য বিশ্বকবি—

## বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ



"জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব;
বাঙালী-আজ গানের রাজা বাঙালী নয় খর্ব।"

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী সকলেই চিনত। সাবেক কালের মস্ত বড় বাড়ী, পুরাতন ঐশ্বর্যের স্মৃতি তার সর্বাঙ্গে লেগে আছে। এই বাড়ীর কর্তা হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্ম হবার পর বাড়ীতে পূজাপার্বণের ব্যবস্থা উঠে গিয়েছে। বাড়ীতে তখন পুরোন দিনের বিধিব্যবস্থা বদলে নতুন দিনের অনেক কিছুর পত্তন হচ্ছে। দেবেন্দ্রনাথ সংসারে থেকেও ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবে থাকেন। বাড়ীতে লোক গম গম করে। এ বাড়ীর চালচলন বড় বিচিত্র। বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ আত্মভোলা লোক। সঙ্গীত আর গণিতে তার গভীর দক্ষতা। বাংলা গদ্যে দর্শনবিষয়ে তিনি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। মেজো ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই-সি-এস। সঙ্গীত ও সাহিত্যে তাঁরও উৎসাহ প্রচুর। পরের দুটি ছেলের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁরও গুণের শেষ নেই, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, নাটক লেখা, অভিনয় করা ইত্যাদি কাজে

তাঁর প্রচুর উৎসাহ। গান বাজনা চলে, সাহিত্য চর্চা হয়, সখের নাটকও অভিনীত হয়। সেই সাথে দেশোদ্ধারের নানা রকম জল্পনা কল্পনাও চলে।

সংসারের এই পরিবেশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটে ছিল। তাঁর জন্ম হয় ১৮৬১ সালে। ধনী পরিবারেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু কোন ভোগবিলাসের মধ্যে তিনি মানুষ হন নি। খাওয়াদাওয়া জামাকাপড়ে কিছুমাত্র তাঁর সৌখিনতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কেটেছিল অন্তঃপুরে চাকরদের মহলে। তারাই বাড়ীর ছোট ছেলেদের দেখাশুনা করত।

ঘরে আর মন টেঁকে না। স্কুলে যাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ। তাই দেখে একবার তাঁর গৃহশিক্ষক বলেছিলেন; "এখন স্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদছ, স্কুলে ভর্তি হয়ে স্কুলে না যাবার জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী কাঁদবে।" ঐ মাষ্টার ঠিকই বলেছিলেন। বিদ্যালয়ের আনন্দহীন পরিবেশে সেখানকার বন্দীজীবন, ভয়ানক শাসন রবীন্দ্রনাথকে অনেক কাঁদিয়েছে। একে একে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল প্রভৃতি বহু বিদ্যালয়ে তিনি পড়েছেন কিন্তু কোথাও তাঁর মন টেকে নি। শেষ পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রামায়ণ, চাণক্য শ্লোক প্রভৃতি বই তিনি বাড়ীতে বসে পড়তেন। পড়াশুনোয় উদাসীনতা রবীন্দ্রনাথের কোনদিন ছিল না। পিতার কাছে তিনি যেভাবে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত পড়েছিলেন, স্কুলে গেলেও তার অর্দ্ধেক পড়া হত কিনা সন্দেহ।

সাত বছর বয়সে একটা নীল খাতায় লাইন টেনে বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে শুরু করেন। সেইগুলি ছড়া জাতীয় কবিতা। তখন বালক রবি বাড়ীর লোকদের ডেকে কবিতা শোনাতেন। তেরো বছর যখন তাঁর বয়স, তখন একবার পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ করেছিলেন। এটা তাঁর জীবনের একটি নূতন অভিজ্ঞতা। আর একবার পিতার সঙ্গে বোলপুরে গিয়ে সেখানে মাঠে আলো-বাতাসে কিছুদিন তাঁর পরমানন্দে দিন কাটে। রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ঐ দুই ভ্রমণের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ছিল দীর্ঘ দিন।

একবার মাঘোৎসবের সময়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান লিখেছেন জানতে পেরে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাকে ডেকে গান গাইতে বলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা গান নিজের দেওয়া সুরে গেয়ে পিতাকে শোনান—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছো নয়নে নয়নে।"

গান শুনে মহর্ষি মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, "দেশের রাজা দেশের ভাষা জানলে, আজ কবিকে উপযুক্ত সম্মান দিতেন। কিন্তু সে যখন হবার নয় তখন আমাকেই দিতে হবে। এই বলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেন।

কিছুদিন বাদে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করলেন। তখন তাঁর বয়েস সতের বৎসর। সেখানে গিয়ে কিছুদিন ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করেন।

মাত্র বছর খানেক সেখানে থাকবার পর রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। তারপর তাঁর দিন কাটতে লাগল নদীর উপরের বোটে, জমিদারী পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে। বাংলার পল্লী সৌন্দর্যের সঙ্গে এবং সেখানকার মাটির মানুষের সঙ্গে এই সময়ে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিও এই সময় হতে স্রোতের মত অগ্রসর হতে থাকে। তার প্রথম কবিতা বালক বয়সেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার পরে একে একে অনেক কাব্যগ্রন্থই প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে মানসী, চিত্রা, সোনার তরী, চৈতালী প্রভৃতি কাব্য বাংলা সাহিত্যের কাব্যজগতে যুগান্তর আনল। বন্ধু ও ভক্তদের উৎসাহে তিনি কয়েকটি ভাল ভাল কবিতা বাছাই করে ইংরাজী ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ করেন। এই কাব্যগ্রন্থ দেশ বিদেশের কাব্যরসিকদের মনোহরণ করল। এই কবিকে সম্মানিত করবার জন্য ১৯১৩ সালে জগদ্‌বিখ্যাত 'নোবেল প্রাইজ' দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবির আসন লাভ করলেন। ঐ পুরস্কারের মূল্য ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। অসাধারণ কাব্য প্রতিভার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডি-লিট' ও গভর্ণমেন্ট 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যে খেয়া, বলাকা, পূরবী, মহুয়া বিশেষ বিখ্যাত। শুধু কাব্য নহে নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা, শেষের কবিতা প্রভৃতি উপন্যাস, অনেক নাটক, অজস্র গান আর অসংখ্য গল্প লিখে তিনি সাহিত্যাকাশে সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হয়ে আলোক বিতরণ করতে লাগলেন। তার ছোটগল্পগুলি এক করে 'গল্পগুচ্ছ' নামক গ্রন্থে সঙ্কলন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কাহিনাকারই নন, দক্ষ সুরকারও বটে, তার পরিচয় ওঁর গানের মধ্যে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া প্রবন্ধ রচনাতেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বও অসাধারণ। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি অসংখ্য সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বাংলাভাষাকে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষার এক আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর তাঁর যশ বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে, সকল দেশ থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসে। ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, জাভা, পারস্য প্রভৃতি দেশে তিনি ভ্রমণ করেন। প্রত্যেক দেশেই তিনি রাজার সম্মান পেয়েছিলেন।

কবি হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নয়। স্বদেশকে তিনি প্রাণ অপেক্ষাও বেশী ভালবাসতেন। কেবল কবিতার কল্পনাজগতে তিনি বিচরণ করেন নি। স্বদেশের সকল ক্ষেত্রে কি ভাবে উন্নতি করা যায় তার জন্য তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না। আমাদের দেশের অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য তিনি তাঁর অসংখ্য কবিতায় দেশবাসীর সকলকে আপনার বলে গণ্য করতে শেখান। এই উপলক্ষে তার রচিত 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' বিখ্যাত কবিতাটি এমন কোন বাঙালী নেই যে পড়ে নি। যখন বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনে সারা দেশবাসী মেতে উঠেছে, সে সময়ে তাঁর রচিত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' বিখ্যাত গানটি ছেলেবুড়োর সকলের মুখে ফিরত। অসংখ্য গান তিনি স্বদেশকে নিয়ে রচনা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের দিনে তিনি পথে হেঁটে হিন্দু-মুসলমানের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন ইংরাজরা নিরস্ত্র ভারতবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পেয়ে সারারাত্রি অশান্ত মনে পায়চারি করেছিলেন। তার পর দৃঢ়তার সঙ্গে তীব্র ভাষায় ঐ ঘটনার নিন্দা করে ইংরাজ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মান 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। সেদিন তিনি যে তেজ ও আত্মসম্মানবোধ দেখিয়ে ছিলেন তার তুলনা নেই। হিজলীর বন্দীনিবাসে দুইজন রাজবন্দীকে যেবার গুলি করে মারা হল, সেবার কলকাতার মনুমেণ্টের তলায় সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্নিময় ভাষায় প্রবল প্রতিবাদ করেন।

শিক্ষাজগতের নিরানন্দ জীবন রবীন্দ্রনাথকে বড় মনোবেদনা দিত। তাই তিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের গাছের ছায়ায়, আকাশের নীচে ছেলেদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হল। এর ওপর গড়ে উঠেছিল বিশ্বভারতী। এখন ভারতের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলাদেশের নয় সারা ভারতের গৌরব। ১৯৪১ সালের ৭ আগষ্ট তিনি আমাদের এই শ্যামল ধরাতলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শত শত বৎসর পার হয়ে গেলেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে মানুষ কোন দিন ভুলতে পারবে না।

---

"বঙ্গ-বাণী কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ-লগ্ন
বাজালে বেণু, মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন।"

# বাংলার বাঘ আশুতোষ



"ন্যায় নিষ্ঠায় চির নির্ভীক, দেখালে নতুন আলো,
সেই আলো-শিখা আজও উজ্জ্বল, ঘুচে গেছে সব কালো।"

কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে খ্যাতনামা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর রুগী দেখা শেষ করে একটু বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় তার শিশুপুত্র বই সেলেট বগলে করে দুমদাম শব্দে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই সে তার বাবাকে সাফ জানিয়ে দিল,—'বাবা, কাল থেকে আমি আর স্কুলে যাব না।'

সে কি? গঙ্গাপ্রসাদ আকাশ হতে পড়লেন। চঞ্চল ছেলেকে কত ভাল কথা বলে বুঝিয়ে-সুজিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছেন, প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই তার লেখাপড়ার উপর এত বিরাগ? দিন ত পড়েই আছে!

ছেলেকে কাছে টেনে এনে ভাল করে তার চোখমুখের দিকে চেয়ে দেখলেন গঙ্গাপ্রসাদ। না মারধোর কেউ করে নি। তবে কি ব্যাপার? ব্যাপার কি ছেলেই বুঝিয়ে দিল। বাবার কোলে বসে মুখ ভার করে বলল, 'ওটা ইস্কুল নয়, ওটা যাত্রা। আমি আর ওখানে যাব না।'

কিছুদিন আগেই সে যাত্রা দেখে এসেছে। আজ প্রথম স্কুলে গিয়ে দেখে সেখানে যাত্রার মত হৈচৈ রৈরৈ আওয়াজ। হুটোপাটি হুড়োহুড়ির শেষ নেই। তাই তার ভালো লাগে নি।

গঙ্গাপ্রসাদ তাকে আদর করে অনেক বুঝিয়ে আবার স্কুলে নিয়ে গেলেন। চঞ্চল ছেলে আবার

বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করল। সেখানে সে সুন্দর করে খাতায় হাতের লেখা লেখে, লেখার শেষে নিজের নাম বড় বড় করে লিখে দেয় শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে মুখোপাধ্যায় বংশে আশুতোষের জন্ম হয়। তার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখনকার একজন নামকরা চিকিৎসক। গঙ্গাপ্রসাদ শুধু রোগীর অসুখ সারানো বিদ্যাই শেখেন নি, কি করে ছেলেকে মানুষ করতে হয় তা তিনি জানতেন। তিনি বালক আশুতোষকে চোখে চোখে রেখে মানুষ করতে লাগলেন। সাহিত্য. ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল সব কিছুর প্রথম পাঠ আশুতোষ পিতার কাছে থেকে পেয়েছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষের পাশে ছায়ার মত থাকতেন। সকালে যখন বেড়াতে যেতেন তখনও আশুতোষকে নিয়ে গল্পের ছলে দেশবিদেশের সহস্র বিচিত্র কাহিনী শোনাতেন। বালক আশুতোষকে একটি টুলের উপর দাঁড় করিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ বক্তৃতা দেওয়া শেখাতেন। তিনি জানতেন আশুতোষ একদিন বড় হবে, তার বক্তৃতার প্রতিটি কথা সকল মানুষ কান পেতে শুনবে। আশুতোষকে বড় করে তুলবেন এটাই ছিল তাঁর একমাত্র সাধ, একমাত্র স্বপ্ন।

চক্রবেড়িয়ার স্কুল ও গৃহশিক্ষকের নিকট পাঠ শেষ করে বালক আশুতোষ ভর্তি হলেন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে। সেখানে তখন সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী। শিশুকাল হতেই আশুতোষ কেবল মেধাবী ছাত্রই ছিলেন না, লেখাপড়ায় তার গভীর অনুরাগ ছিল।

পিতৃদেব ঘুমিয়ে পড়লেই সে লুকিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বই পড়ত। শেষকালে একদিনে বাধ্য হয়ে তাকে একটা ফাঁকা ঘরে আটকে রাখা হল। ঘরে বই খাতা কিছুই নেই। বিদ্যার সাধনার সকল পথ বন্ধ।

সারাদিন নিশ্চিন্ত মনে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘর খুলে গঙ্গাপ্রসাদ দেখলেন এক টুকরো কাঠ কয়লা যোগাড় করে বালক আশুতোষ সারা দেওয়ালে জ্যামিতির আঁক কষে রেখেছে। অত্যাধিক পরিশ্রমে আশুতোষের স্বাস্থ্য অনেক সময় ভেঙ্গে পড়ত।

অতি অল্প বয়সেই আশুতোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এর পর তিনি গণিতে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

আশুতোষ 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করলেন। ইতিমধ্যে তার অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ বিদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য হয়েছিলেন। এর পূর্বেই আশুতোষ আইন পরীক্ষায় পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি করতে শুরু করেন। পরবর্তী কালে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন।

আশুতোষের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা উন্নতি বিধান। ১৯০৬ থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পর পর চার বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। আশুতোষের চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়েছিল। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ভবন, বিজ্ঞান কলেজ, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ খোলা সম্ভব হয়েছিল। বাংলা সাহিত্য ও বিভিন্ন ভাষায় এম, এ, পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষা আশুতোষের চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল।

আশুতোষ অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে থাকতেন। হাইকোর্টের জজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার কোন উচ্চপদই তার সরল জীবনে কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। একটি সাধারণ ধুতি ও একটি খাটো কোট এই ছিল তার চিরদিনের পোষাক। ইংরাজ রাজপুরুষদের কাছেও তিনি এই পোষাকেই যেতেন। কঠিন শয্যা তিনি পছন্দ করতেন, মোটের উপর একখানি চাদর বিছিয়ে শোয়া স্যার আশুতোষের অভ্যাস ছিল।

আশুতোষ অল্পে তুষ্ট থাকতেন। যে কেহ নিমন্ত্রণ করলে আশুতোষ সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। তিনি লাট সাহেবের নিমন্ত্রণও যেমন গ্রহণ করতেন তেমনি মোটর চালকের বাড়ীতেও আনন্দ সহকারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন। এ বিষয়ে তাঁর নিকট ছোট বড়র কোন ভেদাভেদ ছিল না।

আশুতোষ যে এত বড় হতে পেরেছিলেন তার প্রধান কারণ তাঁর শৃঙ্খলাবোধ। তিনি রোজ-কার জীবনে ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করে যেতেন। শৈশবকাল হতেই তিনি ভোরে উঠতে অভ্যস্ত ছিলেন। ভোর চারটার সময় তিনি ঘুম থেকে উঠতেন এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ আরম্ভ করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই নিয়ম রক্ষা করে এসেছেন। আলস্যকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন এবং যে কাজে হাত দিতেন তাই পরিপাটিরূপে শেষ করতেন।

আশুতোষ খুব রাশভারি লোক ছিলেন। তাঁর কাছে যেতে অনেকেই ভয় পেত। কিন্তু আশুতোষের মন ছিল ফুলের মত কোমল। বঙ্গদেশে আশুতোষ অপেক্ষা ছাত্রগণের অন্তরঙ্গ বন্ধু আর কেউ ছিল না। ছাত্ররা সেটা জানত। তাই যে কোন বিপদে-আপদে তারা আশুতোষের নিকট দাঁড়াত। তারা যে কেবল অর্থ সাহায্য বা পুস্তকের জন্য তাঁর নিকট আসত তা নয়, নানা বিপদে তারা আশুতোষের কাছে উপদেশ গ্রহণ করবার জন্য উপস্থিত হত। শত অসুবিধার মধ্যেও আশুতোষ তাদের কথা শুনতেন, কখনও ফিরিয়ে দিতেন না।

আশুতোষের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। যাকে তিনি একবার দেখেছেন তার নাম-ঠিকানা বহু বৎসর পরেও আশ্চর্যজনক ভাবে মনে রাখতে পারতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাঁর কাছে ভীড় করতে আসত,

তাদের প্রত্যেককে তিনি মনে রাখতেন। তাঁর বিশাল গ্রন্থাগারে কোথায় কি বই আছে সেটা তিনি অনায়াসে মনে করতে পারতেন।

আশুতোষ অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন, কোন অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেই কারণেই দেশবাসী তাঁকে 'বাংলার বাঘ' নাম দিয়েছিল।

তেজস্বী নির্ভিক পুরুষ আশুতোষ তাঁর জননীকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। আশুতোষের জননী তাঁকে বিলেতে যেতে আপত্তি করায় আশুতোষ লর্ড কার্জনের বিলেতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি। লর্ড কার্জন আশুতোষকে অনেক বুঝিয়েও যখন রাজী করাতে পারলেন না তখন বললেন ঃ "আপনি যান, আপনার মাকে গিয়ে বলুন যে ভারত-সম্রাটের প্রতিনিধি সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল তাকে যেতে আদেশ করেছেন।" আশুতোষ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন "তা হলে আমি আমার মায়ের পক্ষ হতে জানাব যে, তার পুত্রের ওপর আদেশ করবার অধিকার, তিনি ভিন্ন আর কারোও আছে, একথা কিছুতেই আমি স্বীকার করি না।"

জীবনের নানা বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়ে ১৯২৪ সালের ২৫শে মে, তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

---

**মানুষের মধ্যে ছোট-বড়র কোন ভেদাভেদ নেই।**

## দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন



"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

কোর্টে যাবার পথেই ব্যারিষ্টার সাহেবের বাধা পড়ল। তাড়া আছে কিন্তু না দাঁড়ালেও নয়। লোকটি যে ভাবে এসে কেঁদে সামনে দাঁড়াল, তাতে না দাঁড়িয়ে পারা যায় না। লোকটির ছেঁড়া চাদরের ফাঁক দিয়ে পৈতে দেখা যাচ্ছে, বোঝা গেল গরীব ব্রাহ্মণ। চেহারা বেশভূষার দিকে এক নজরেই জানা যায় যে দারিদ্রের চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কাঁদতে কাঁদতে ব্রাহ্মণ বললেন, 'যে তিনি বড় গরীব। টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না। অথচ এখনি বিয়ে না দিলে সমাজে তাঁকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে।' কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় বাঙালী পিতার মুখচ্ছবি তাঁর অন্তরে রেখাপাত করল।

ব্যারিষ্টারের চোখে জল এল। তিনি শুধু ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে হাইকোর্টে ছুটির পর দেখা করবেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

ব্রাহ্মণ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। হাইকোর্টে হেঁটে পৌঁছতে হলে এখনই তাকে রওনা দিতে হয়।

বিকেলবেলা হাইকোর্ট হতে ব্যারিষ্টার বেরিয়ে ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। পকেট হতে এক তাড়া নোট বের করে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বললেন, "ঠাকুরমশাই, এই টাকা দিয়ে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন।"

সর্বসাকুল্যে এক হাজার টাকা। এত বিস্ময় ব্রাহ্মণের জীবনে কখনো হয় নি। আনন্দে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "আপনি রাজা হবেন, ভগবান আপনাকে রাজা করবেন।"

চিত্তরঞ্জন দাস রাজার চেয়েও বড় ছিলেন। তাঁর উপার্জন প্রচুর ছিল, ঐশ্বর্যের শেষ ছিল না। কিন্তু একদিন দেশের সেবায় রাতারাতি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে বের হয়েছিলেন। সেদিন ভিখিরীর বেশে তিনি সারা জগতের হৃদয়রাজ হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর কলকাতায় চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম হয়। পিতা ভুবনমোহন দাস ছিলেন তখনকার দিনের নামকরা এ্যাটর্নি।

দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে চিত্তরঞ্জনের বাল্যকাল কাটে। বালক চিত্তরঞ্জনকে দেখা যেত সহপাঠীদের ও সঙ্গীদের সুখে দুঃখে পাশে পাশে থেকেছেন। সহপাঠীরাও তাঁকে গভীর ভাবে ভালবাসত। লণ্ডন মিশনারী স্কুল হতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। সহপাঠীরা সকলে দেখল চিত্তরঞ্জন দাস বলে ছাত্রটি যেমন পড়াশুনায় ডুবে থাকে, তেমনি সুন্দর বক্তৃতাও দেয়।

বিলেতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে গেলেন চিত্তরঞ্জন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। ইংলণ্ডের লোকজনদের কাছে সুবক্তা বলে চিত্তরঞ্জন ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। একবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে ভারতবাসীদের উপর ইংরাজদের অত্যাচার, অবিচারের কথা এমন সোজাসুজি বললেন যে সভায় সকলে চুপ করে গেল। কর্তারাও বুঝলেন যে ব্যক্তি এই রকম জোরালো বক্তৃতা দিতে পারে ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাঁকে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিলে ভারতের লাভ কিন্তু ইংরাজদের লোকসান। সুতরাং চিত্তরঞ্জনকে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া হল না। তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যারিষ্টারি পাশ করে দেশে ফিরলেন।

সুখে-সাচ্ছন্দে মানুষ হয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন কিন্তু এইবারে দুঃখে পড়লেন। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন বিশাল ঋণ রেখে মারা যান। চিত্তরঞ্জন প্রথমে একে একে পিতার ঋণ শোধ করলেন। পিতৃভক্তের যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তখন বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন পুরাদমে চলছে। এই আন্দোলন চিত্তরঞ্জনের মনে সহজেই নাড়া দিল। স্বদেশী করার জন্য বহু অভিযুক্ত ব্যক্তির মামলা চিত্তরঞ্জন কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে করে দিয়েছেন। ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দ তখন বোমার মামলায় পুলিশের কারাগারে বন্দী হয়েছেন। চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষের ব্যারিষ্টার হয়ে কোর্টে দাঁড়ালেন।

মামলা চলল ছয় মাস ধরে। সরকারী পক্ষের ঝানু ব্যারিষ্টার নর্টন আর আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টার এক তরুণ বাঙ্গালী, ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশ। সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে চিত্তরঞ্জন ঐ মামলা

চালালেন। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকার পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। সারা দেশে সেদিন হুলস্থূল পড়ে গেল। ঐ মামলা পরিচালনার সময়ে চিত্তরঞ্জন এমন সুন্দর বক্তৃতা দেন যে তাহা আদালতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এমন যুক্তিপূর্ণ কাব্যময় বক্তৃতা আদালতে এর পূর্বে কেহ দিতে পারে নি। ঐ বক্তৃতাতেই তিনি বলেছিলেন যে—দেশকে ভালবাসা যদি দোষ হয়, তবে তিনিও একজন দোষী।

আলিপুর মামলায় জয়লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে চিত্তরঞ্জনের নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে তাঁর খ্যাতি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; ফলে পসার ও প্রতিপত্তি অনেক বাড়ল। সি, আর, দাশ দিনে হাজার টাকা এক সময় রোজগার করতে লাগলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে প্রচুর আয়ে রাজার মত ভোগে সুখে যে চিত্তরঞ্জন দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি সহসা দেশের ডাকে সর্বস্ব ত্যাগ করে কেমন করে ভিখারীর বেশ অঙ্গে তুলে নিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর ডাক দেশবন্ধুর কানে এসে পৌঁছল।

দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতীক সাধারণ চেহারার ঐ ব্যক্তিটির অসাধারণ গুণ ছিল। গান্ধীজি যখন বুঝতে পারলেন যে অস্ত্রের দ্বারা প্রবল বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করা অসম্ভব তখন তিনি স্থির করলেন ইংরাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করতে হবে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য হবে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করা, স্বদেশী জিনিষ গ্রহণ করা। ইংরাজ তার দেশের জিনিষ এদেশে বেচে সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে আর দেশের লোক অন্নাভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরছে। মহাত্মাজীর এই আহ্বানে দেশের সকল লোক সাড়া দিল। বিদেশী জিনিষপত্র বয়কট শুরু হল, লোক ঘরে ঘরে চরকা কেটে তার সূতোয় খদ্দর বুনে পড়তে লাগল।

চিত্তরঞ্জন দাশ তখন তখন দাশসাহেব, মাসে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা আয়। দেশের ডাকে তিনি এক মুহূর্তে সবকিছু ছেড়ে জনসাধারণের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। লোকে বুঝল ইনিই দেশের সকলের আপনার প্রিয়জন। ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশ, হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

এখন কেবল দেশবন্ধুর কাজ হল দোরে দোরে ঘুরে দেশের লোককে ডেকে বলা, তোমরা দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে, সকল প্রকারের বিলাসিতা ছাড়, খদ্দর পরো। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। দেশবন্ধুর ডাকে সারা দেশ উতল হয়ে উঠল। দলে দলে লোক তাঁর অনুগামী হল।

ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেখলেন এই আন্দোলন দমন না করলে তাদের দারুণ ক্ষতি। তাই ঐ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দমন করবার জন্য তাঁরা যত প্রকার হিংসাত্মক পন্থা তাছে তা সবই গ্রহণ করলেন। দলে দলে বাঙ্গালী যুবকদের বন্দী করা হল। শোভাযাত্রা ও আন্দোলনে পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালাতে লাগল। কিন্তু—'বেত মেরে তুই মা ভোলাবি, আমি নয় তোর

তেমনি ছেলে।' প্রতিদিন আঘাতে জর্জরিত হয়ে শত শত লোক জেলে যেতে লাগল। কারাগারও বন্দেমাতরম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। আন্দোলন করার জন্য চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর ইংরাজ সরকার চিত্তরঞ্জনকে একদিন গ্রেফতার করে দীর্ঘ কারাবাসের দণ্ড দিলেন। চিত্তরঞ্জন হাসিমুখে জেলে গেলেন।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর রাজনীতি নিয়ে নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হয়, ফলে গয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পর কংগ্রেস দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। দেশবন্ধুর দলের নাম হল 'স্বরাজ্য দল'। ব্যবস্থাপক সভায় থেকে অন্যায় আইন করা বন্ধ করবার কাজ হল এই দলের। 'ফরোয়ার্ড' বলে তিনি একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ভার নিলেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়ে চিত্তরঞ্জন দেশের যা সেবা করেছেন তার তুলনা হয় না। দরিদ্র ছেলেরা যাতে নিঃখরচায় লেখাপড়া শিখতে পারে তার জন্য তিনি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মোটা খদ্দর পরা, চোখে মুখে প্রশান্ত হাসি, উদাসীর মত এই মহামানবকে তখন দেশবাসী প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। দেশের প্রতিটি লোকের দুঃখে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, দেশের প্রতিটি দুর্দশায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

দেশবন্ধুর সাহিত্যপ্রীতি ছিল অপরিসীম। তাঁর লেখা বহু কবিতা তখনকার দিনে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হত। পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এ ছাড়া 'নারায়ণ' নামে সুন্দর একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি পরিচালনা করতেন।

দেশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে দেশবন্ধুর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি দার্জিলিং-এ স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য যান। কিন্তু সেই তাঁর শেষ যাওয়া। ১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁর শবদেহ নিয়ে সেদিন যে শোভাযাত্রা বের হয়েছিল তার তুলনা নেই। যিনি দেশের জন্য সব দিলেন শেষ পর্যন্ত প্রাণও দিলেন। সেই অমর মহাপুরুষকে দেশবাসী কোনদিনই ভুলবে না।

---

আগে স্বাধীনতা পরে সব কিছু।

# দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র



"বিপ্লবী-বীর নেতাজী সুভাষ, তুমি তো এলে না ফিরে ;
তোমারি বিহনে কাঁদিছে জননী, বিপুল অশ্রুনীরে ।"

সিঙ্গাপুরের এক জনসভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করছেন, "বন্ধুগণ, পরাধীন জাতির কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়ে বড় সম্মান ও গৌরব আর অন্য কিছুই নেই। আলোকে-অন্ধকারে, দুঃখে-সুখে, জয়-পরাজয়ে আমি সর্বদা তোমাদের পাশে পাশে থাকব। এখন তোমাদের আমি যা দিতে পারছি তা হল জ্বালা-যন্ত্রনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখকষ্ট, দুর্গম অভিযান ও মৃত্যু।"

বক্তৃতা শেষে নেতাজী আজাদ-হিন্দ-ফৌজের তহবিলের জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থ ভিক্ষা চাইলেন। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ী তখন অনেক। লাইন করে এক এক করে সকলে নেতাজীর সামনে এসে তহবিলে টাকা দিতে লাগল। এমন কি এক ভিখারিনী পর্যন্ত তার শেষ সম্বল দুটি টাকা দান করল।

এই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাঙলা ও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ গৌরব। ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করবে। অসীম ত্যাগ, বীরত্ব এবং দৃঢ় চরিত্রের সহিত কোমলতা, নেতাজীর জীবন সকল মানুষের মনে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

উড়িষ্যার কটক জেলায় ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম। পিতা জানকীনাথ ও মাতা প্রভাবতী দেবীর কাছ থেকে তিনি তেজস্বিতা, দয়া-মায়া, স্নেহ প্রভৃতি সদগুণগুলি আয়ত্ত করেছিলেন।

১৯১৩ সালে কটক রাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল হতে তিনি সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনে তার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন দুজন মহাপুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। বিদ্যালয়ে পড়বার কালেই তিনি খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন, এমন কি রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শে তিনি একটি সেবাদল গড়ে তুলেছিলেন। তাদের কাজ ছিল গরীব দুঃখীর সেবা-শুশ্রূষা ও সাহায্য করা।

নেতাজী তাঁর মাতৃদেবীকে কটক হতে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—"মা! ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান,—এই মহাদেশে লোক শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে পাপক্লিষ্ট ধরনীকে পবিত্র করেছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপন করে গিয়েছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করে নিজের অংশাবতাররূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নি—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ…। এই পত্রে জন্মভূমির প্রতি সুভাষচন্দ্রের আনুগত্য ও ভালবাসার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। সেই সময়ে তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং ভারতের বহু তীর্থে ঘোরেন। কিন্তু মন ভরল না, তাই আবার ঘরে ফিরে আসেন। তাঁর বৈরাগ্য মনের পরিচয় ছাত্র-জীবনের ঐরূপ নানা ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়।

আই, এ পাশ করবার পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পড়তে শুরু করেন। সেই সময়েই কলেজের ইংরাজী প্রফেসর ওটেন সাহেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। ওটেন সাহেব অত্যন্ত ভারত-বিদ্বেষী ছিলেন। ক্লাশে তিনি প্রায়ই ভারতীয়দের অবমাননাসূচক কথা বলতেন। সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার অনুগত কয়েকজন মিলে একদিন ওটেন সাহেবকে অসম্মান দেখিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন। সাহেবদের তখন সাতখুন মাপ হত। সাহেবকে অপমান করার অপরাধে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বহিষ্কৃত হলেন। সুভাষচন্দ্রের লেখাপড়া ঐখানেই সাঙ্গ হয়ে যেত কারণ তিনি যাহাতে কোন কলেজে ভর্তি হতে না পারেন সেইরূপ ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করে রেখেছিলেন। কিন্তু স্যার আশুতোষের সহায়তায় স্কটিশ চার্চ কলেজে এসে ভর্তি হন এবং সম্মানের সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সে আমলের মেধাবী ছাত্র মাত্রই সুযোগ পেলে বিলাত যেতেন আই, সি, এস, পরীক্ষা দেবার জন্য। সুভাষচন্দ্রও ঐ কারণে বিলাত যাত্রা করলেন। তাঁর মত মেধাবী ছাত্রের পক্ষে আই, সি, এস, পাশ করা বিন্দুমাত্র কঠিন হল না।

বিলাতে থাকতেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা, মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রাম পরিচালনার কথা

সুভাষচন্দ্রের কানে গিয়ে পৌঁছায়। দলে দলে লোক দেশের জন্য জেলে যাচ্ছে, দলে দলে লোক দেশের জন্য জন্য নিপীড়িত হচ্ছে, এই সব সংবাদ সুভাষচন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌঁছাত। স্বদেশের প্রতি অনুরাগ সুভাষচন্দ্রের যেন শতগুণ বেড়ে গেল। আই, সি, এস হলেন বটে কিন্তু ইংরাজ সরকারের কোন চাকরি গ্রহণ করতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করে দেশসেবায় মহান ব্রত গ্রহণ করলেন। দেশে ফিরে বোম্বাইতে তিনি জাতির নেতা মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। মহাত্মা তাঁকে পাঠালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে। তখন দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। এই হীরের টুকরোটি পেয়ে দেশবন্ধুর আর আনন্দের সীমা রইল না।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করেন ১৯২১ সালে। তার পর হতে দেশসেবা ছেড়ে মূহূর্তের জন্যও তিনি বিশ্রাম নেন নি। তাঁকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। কোন শাস্তিই তাঁকে দেশসেবার ব্রত হতে বিচলিত করতে পারে নি। কখনো কর্পোরেশনের মেয়ররূপে, কখনো উত্তর বঙ্গের বন্যায় সেবাদলের নেতারূপে, কখনো ভারতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি দেশের সেবা করেছেন। সকল ক্ষেত্রেই তাঁর সংগঠনশক্তি, রাজনীতিজ্ঞান ও মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যেত। দ্বিতীয়বার যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন সুভাষচন্দ্র, তখন ভারতে মহাত্মা গান্ধী দেশের লোকের কাছে অধিকপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু নেতাদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় তিনি রাষ্টপতি পদে ইস্তফা দিলেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটল। সুভাষচন্দ্র একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। তার নাম 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। এই দলের লক্ষ্য ছিল যাতে স্বাধীনতা লাভের কাজ দ্রুত হতে পারে। ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই দলে যোগদান করলেন।

১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র বিনা বিচারে প্রথমে কারারুদ্ধ হলেন। তারপর তাঁকে তাঁর বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখা হল। কিন্তু ১৯৪১ সালে তিনি সকলের চোখে ধূলো দিয়ে অদৃশ্য হলেন। মৌলবীর বেশে, গরুর গাড়িতে করে, অন্ধকারে অনেক বিপদসঙ্কুল পথ হেঁটে, জিয়াউদ্দিন এই ছদ্মনাম গ্রহণ করে তিনি আফগানিস্থানে আসেন। তারপর থেকে জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ ঘুরে সিঙ্গাপুরে আসেন। সিঙ্গাপুরে এসে তিনি ভারতীয়দের নিয়ে একটি দেশীয় বাহিনী গঠন করলেন। তার নাম হল 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। এই সেনা বাহিনীর নেতা হলেন সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। এই সময় হতেই তিনি নেতাজী নামে পরিচিত হলেন। স্থির হল যুদ্ধ করে এই বাহিনী ভারতে এসে তাকে স্বাধীন করবে। নেতাজীর দিল্লী চলো আহ্বান বেতার মারফৎ দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে ব্রহ্মদেশ হতে টোকিও যাবার পথে এক বিমান দুর্ঘটনায়। তার কোন প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় নি। তাই দেশবাসী আজও তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছে।

---

**তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।**

# বিজ্ঞান-তপস্বী জগদীশচন্দ্র



বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়াছ তুমি, জয়মাল্যখানি সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে পরায়েছ ধীরে।

সারা জগৎ একদিন বিস্ময়ে চমকে উঠলো যে মানুষের মত গাছপালারও প্রাণ আছে তাদের সুখ-দুঃখ আছে। এই বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন কে জানো? তিনি হচ্ছেন বাংলার গৌরব বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৫৮ সালে ঢাকা জেলার বাড়িখাল গ্রামে। তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর বাল্যকাল কাটে ফরিদপুরের এক গ্রাম্য স্কুলে। পরে কলকাতায় এসে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। কিছুদিন পর হেয়ার স্কুল ছেড়ে দিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। সেখানে স্কুলের হোষ্টেলের এক কোণে জগদীশচন্দ্র একটি বাগান তৈরী করলেন। সেখানে নিজের হাতে লাগালেন ছোট ছোট গাছ, আর তৈরী করলেন কৃত্রিম নদী ও পুল। এর পরে সম্মানের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেন। তারপর শুরু হল নতুন জীবন এলেন কলেজে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকেই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে আই, এ, এবং বি, এ, পাশ করেন। এরপর জগদীশচন্দ্র গেলেন বিলেতে। ক্রমে ডাক্তারী পড়া শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর ডাক্তারী পড়া ভাল লাগল না, কাজেই ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞান পড়া শুরু করলেন।

জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ হতে বিজ্ঞানে বি, এ, পাশ করেন এবং পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি, এস, সি, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এরপর জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯০০ সালে প্যারিসে বিশ্ববিজ্ঞান মহাসম্মেলনে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এ আবিষ্কার করে আচার্য জগদীশচন্দ্র বিপুল প্রতিভার পরিচয় দেন। এই আবিষ্কার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রমাণ করলেন—উদ্ভিদের অনুভব শক্তি আছে, প্রাণ আছে। তাঁর এই আবিষ্কৃত যন্ত্রের নাম 'ক্রেস্কোগ্রাফ'। গাছ-গাছড়া ধীরে ধীরে কেমন করে বাড়ে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে অবিকল দেখা যায়। এ ছাড়া ১৯১৪ সালে গাছ-পালার স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া মাপবার যন্ত্রও আবিষ্কার করলেন। এর নাম "রিজোনাণ্ট রেকর্ডার"।

দিনের পর দিন পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠ করে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা জগদীশচন্দ্রের মহতী প্রতিভাকে স্বীকার করে নিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে ডি, এস, সি, ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। ভারত সরকারও আচার্য জগদীশচন্দ্রকে 'সি, আই, ই., সি-এস-আই', ও 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছিলেন।

যে বেতার আজ আমরা ঘরে ঘরে শুনতে পাই, সেই বেতারের মূল আবিষ্কারক আচার্য জগদীশ-চন্দ্র। তাঁর এই আবিষ্কার চিরস্মরণীয়। যদিও বেতার আবিষ্কারের জন্য আজ মার্কনির নাম সমাদৃত —তবুও জগদীশচন্দ্রই প্রথম বিনা তারে বার্তা প্রেরণের কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'এল-এল-ডি' উপাধি এবং রয়েল সোসাইটির সদস্য পদ "এফ, আর, এস," লাভ করেন।

১৯১৭ সালে ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন সেদিন সার্থক হল। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা সত্যে পরিণত হল। তাঁর উপার্জনের অধিকাংশ ব্যয় করে এই বিখ্যাত গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গায়ে তাম্রফলকে তিনি তাঁর মনোবাসনা লিপিবদ্ধ করলেন—ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেব চরণে নিবেদন করিলাম।—জগদীশচন্দ্র বসু।

১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর ভারতের এই মহাপ্রাণ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু গিরিডিতে পরলোক গমন করেন। দেশবাসী একটি "বিজ্ঞান রত্নকে" হারালেন।

---

মানুষের মত গাছপালারও প্রাণ আছে।